বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" এর ভূমিকা

Dhaka University Library
403581

GIFT

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ
২০০৬

403581

গবেষক
মোস্তারী আহ্‌মেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" এর ভূমিকা

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোস্তারী আহ্‌মেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403581

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন - ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪৪৬০
ফাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
E-mail : duregstr@bangla.net

তারিখ : ২০-০৬-২০০৬

প্রত্যয়নপত্র

[Letter of Certification]

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা"-এর ভূমিকা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোস্তারী আহমেদ আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করেছে। এটি তার নিজস্ব গবেষণালব্ধ মৌলিক কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল ডিগ্রী অর্জণের জন্য এটি দাখিল করার ক্ষেত্রে আমি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সম্মতি প্রদান করছি।

(ড. হারুন-অর-রশিদ)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403581

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২০-০৬-২০০৬

ঘোষণাপত্র
[Declaration]

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত **বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা"-এর ভূমিকা** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক কর্ম। এটি বা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য অন্যত্র কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আমি দাখিল করি নি।

(মোস্তারী আহমেদ)

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা"-এর ভূমিকা শিরোনামে আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে যারা আমাকে মূল্যবান সময় এবং শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কর্মটি সমাপ্ত করতে হয়েছে বলে এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এর দায়দায়িত্ব আমার। তবে গবেষক হিসেবে আমার ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এতটুকু কমতি ছিল না।

প্রথমেই আমি উল্লেখ করবো আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. হারুন-অর-রশিদ-এর নাম, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধান করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়" অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকেই আমাকে সাক্ষাতকার ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন মামলার ২৬নং অভিযুক্ত কর্নেল (অব:) শওকত আলী এম.পি., যার সার্বক্ষণিক উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও আন্তরিকতা আমাকে এ-কাজে নিরন্তর সাহস যুগিয়েছে।

অন্যান্য যারা সাক্ষাতকার দিয়েছেন তাদের কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করছি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন-এর পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রতি আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অধ্যাপক মো: আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া স্যারের কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করছি।

আমার স্নেহের ছাত্রী রুবিনা আমিন উর্মী প্রুফ দেখার কাজে আমায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করে আমায় ধন্য করেছে। এছাড়া বাংলা একাডেমীর মোহাম্মদ মীর হোসেন-যিনি কম্পিউটার কম্পোজের মাধ্যমে আমার কাজটি সম্পন্ন করতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তার কাছেও আমি ঋণী।

সবশেষে, এ গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ও প্রজন্মের সন্তানদের ইতিহাস চর্চায় সামান্যতম অবদান রাখতে সক্ষম হলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

(মোস্তারী আহমেদ)

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবা ও মা-কে
আমার এ সৃষ্টির স্পর্শ যাদের আমার চেয়েও বেশি সুখী করবে।
আর আমার দুই সন্তান
শাবাবা আদনীন মুনলীন
ও
মাসাবা আদনীন সানলীনকে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" এর ভূমিকা

সূচিপত্র

	ভূমিকা	১
অধ্যায় ১	গবেষণার তাত্ত্বিক বিন্যাস	৭
	১.১ প্রকল্প প্রণয়ন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ	
	১.২ গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস	
	১.৩ গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত	
	১.৪ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
অধ্যায় ২	পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা	১১
অধ্যায় ৩	মামলা দায়ের ও অভিযোগ গঠন	২০
অধ্যায় ৪	ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিচার কার্য পরিচালনা ও অভিযোগ খণ্ডন	২৭
অধ্যায় ৫	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আইউব সরকারের উদ্দেশ্য	৩৯
অধ্যায় ৬	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততা	৪৮
অধ্যায় ৭	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান	৬৬
অধ্যায় ৮	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা	৭৭
	উপসংহার	৮৪
	তথ্যপুঞ্জি	৮৮
	পরিশিষ্ট-১	৯৯
	পরিশিষ্ট-২	১৩৫
	পরিশিষ্ট-৩	১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।"[১] বাঙালি-জাতির দীর্ঘ-সংগ্রাম মুখর ইতিহাসে এ ঘটনা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। এ বিদ্রোহাত্মক ঘটনা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্বরান্বিত করে। বিশিষ্ট সাংবাদিক (তৎকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকার চীফ রিপোর্টার), ফয়েজ আহমদ এর মতে, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা মামলার ভূমিকা ছিল অসাধারণ। এ মামলা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ মামলার অভ্যুদয় না ঘটলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এত দ্রুত অগ্রসর হতো না। মুক্তিসংগ্রাম অবশ্যই হতো, কিন্তু তার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হতো। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে এ মামলার অবদান অনস্বীকার্য।"[২] এ মামলার সূত্র ধরেই সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন সামরিক শাসক আইউব খান। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে নতুন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান দেশে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এ মামলার ধারাবাহিকতার ফসল। এ বিজয় পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ফসল। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বাঙালিরা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬% ভাগ। পাকিস্তানের বাকী চারটি প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৪৪% ভাগ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হতে থাকে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। একই সাথে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল পশ্চিমাদের হাতে। পাকিস্তানের রাজধানী, কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস-আদালত, বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান দপ্তর স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে যার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাড়তি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। তিন সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর, তাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলার জনগণকে সার্বিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ২০০০ কিলোমিটার ভারতীয় ভূ-খণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কোন মিল ছিল না। ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য,

---

১. আব্দুর রাজ্জাক, সাক্ষাতকার তাং ১১-০৯-০৩ ঢাকা, আরো, কর্নেল শওকত আলী, এম, পি, সাক্ষাতকার তাং ১৫-০৯-২০০৩।

২. ফয়েজ আহমদ, সাক্ষাতকার তাং ১৭-০৯-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাচার, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। "পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল ছিল একটি মধ্যযুগীয় সামান্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। অন্যাদিকে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যবোধ ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচারণ করা ছিল একটি সহজাত প্রবৃত্তি।"[৩] বাঙালিরা মনে প্রাণে ধার্মিক হলেও চরিত্রগত ভাবে ছিল অসাম্প্রদায়িক ও পরধর্মসহিষ্ণু। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ধর্মের মর্মবাণী অনুধাবন না করে বাহ্যিক বাগাড়ম্বরিতায় গাভাসাতো। "ধর্মীয় আচরণে ও কথাবার্তায় তারা ছিল কট্টর সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র।"[৪]

পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরের ইতিহাসে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা পশ্চিমাদের দ্বারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। তারপরও তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মূলতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির পরই পূর্ব বাংলার বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথ প্রথম রঞ্জিত হয় শহীদের রক্তে। পাকিস্তানকে ঘিরে বাঙালিদের স্বপ্ন দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। বাঙালিরা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। শুরু হয় শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের দ্বন্দ্ব। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা তা দেখতে পাই। এ সময়কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে ছিল : ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল, পাকিস্তানের সংবিধান রচনার প্রহসন, সামরিক শাসন জারি, আইউব খানের ক্ষমতা দখল, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৬ এর ছয় দফা কর্মসূচি[৫] আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, আইউব

---

৩. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭১।

৪. কর্নেল শওকত আলীর সাক্ষাতকার তাং ১৫-০৯-২০০২, পূর্বোক্ত।

৫. ছয় দফায় বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও পরিষদসমূহ সার্বভৌম হবে।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়--প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রা ব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

অথবা

সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

৪. সবরকম কর ও শুল্ক ধার্য করা ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সাথে সাথেই সে অংশটুকু ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এই টাকাতেই ফেডারেল সরকার চলবে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পতন, ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতারোহণ, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, সর্বশেষে স্বাধীনতা।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য রক্তদান পূর্ববাংলার বাঙালির জাতীয় জীবনে এক নতুন দিক নির্দেশনা দান করে। এটা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রথম ধাপ। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের 'সংখ্যাসাম্য নীতি'র[৬] আওতায় আনা হয়। তাতেও কাজ না হলে ১৯৫৮ সালে প্রথম ইস্কান্দার মির্জা এবং কিছুদিন পর আইউব খানের নেতৃত্বে দেশে 'মার্শাল ল' জারি করা, গণতন্ত্র হরণ, মৌলিক অধিকারের অস্বীকৃতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অবিচার শোষণ বাঙালিদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেয়। সতের দিন স্থায়ী পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালিদের জন্য ছিল বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ব বাংলার বাঙালিরা যুদ্ধকালীন সময়ে ছিলো একেবারেই অরক্ষিত। যখন বাঙালি সৈনিকরা প্রানপণ যুদ্ধ করে পাঞ্জাবের লাহোর শহর রক্ষা করছিল তখন তাদের নিজ জন্মভূমির (পূর্ব বাংলা) নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় পাকিস্তান সরকার। আর সে পটভূমিতেই শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন ঐতিহাসিক 'ছয় দফা কর্মসূচী'। এ কর্মসূচি পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবের দেয়া ছয় দফা কর্মসূচি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল যা বাঙালিদের সার্বিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে এ কর্মসূচি সমাদৃত হয়। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব দ্রুত বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। একই সাথে ছয় দফা কর্মসূচি রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং শাসক মহলকে শঙ্কিত করে তোলে।

আইউব খান ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে শেখ মুজিবকে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই শেখ মুজিবকে আইউব করাবন্দী করে। ছয় দফার উপর বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য দেয়ার অপরাধে শুধু এক মাসে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১২ টিরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সবগুলি মামলায় জামিন পাওয়ার

---

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমান ভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্যকোন হারে আদায় করা হবে।

৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা সামরিক রক্ষী বাহিনী গঠন, পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব-পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

* শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রচিত *'আমাদের বাঁচার দাবী'* থেকে সংক্ষেপিত।
উৎস : প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৪৭-১৯৭১), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৪।

৬. জাতীয় পরিষদ প্রতিনিধিত্বসহ অন্যান্য বিষয়ে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতির অনুসরণ। অবশ্য বাস্তবে বহুক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটেনি।
উৎস-ড. হারুন অর রশিদ, *বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* ১৯৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

পর অবশেষে ১৯৬৬ সালের ৯ মে তাঁকে D.P.R. (Defence of Pakistan Rule) এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিব এরপর আর জামিন পান নাই। D.P.R. এর আওতায় কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবকে ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি যে মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়, তা ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'।

পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া, পূর্ব বাংলাকে নেতৃত্বহীন করা এবং পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করা, একই সাথে ভারতের সহায়তায় পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডনের দায়ে শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করাই ছিল আইউব খানের দায়ের করা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানি সামরিক চক্র ও আমলারা বুঝতে পেরেছিল যে, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের পক্ষে চলে যেতে পারে। তাই তারা প্রথম থেকেই অনিয়মতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক ভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে থাকে। অস্ত্র দিয়ে বাঙালিকে দমিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালায়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে সুকৌশলে বাঙালিদের দূরে সরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল, একই সাথে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের দ্বারা ক্রমাগত পিষ্ট হচ্ছিল সাধারণ বাঙালি এ ব্যাপারে প্রথমদিকে ততটা সচেতন ছিল না। আস্তে আস্তে সচেতন বাঙালি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা যতটা তীব্রভাবে এ বৈষম্যমূলক আচরণ ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল, সাধারণ মানুষ ততটা ছিল না। এ প্রসঙ্গে আব্দুর রউফ লিখেছেন, "আমরা যারা সামরিক বাহিনীর চাকুরীতে স্বল্পসংখ্যক বাঙালি সদস্য আছি, আমরা যত তীব্রভাবে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ এবং বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষ কিন্তু ততটা বিক্ষুব্ধ কিংবা আহত নয়। কারণ আমাদের মতো প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগার মতো ঘটনা সচরাচর ঘটতো না। এটা অবশ্য তাদের দোষ বা দুর্বলতা নয়, পশ্চিম পাকিস্তান ছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। শোষণের চিত্রও তাদের সামনে জ্বল জ্বল করে না। ফলে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আমাদের অনুভূতি যত তীব্র সাধারণ মানুষের তেমন ছিল না।"[৭] তাই "পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক বাঙালি সেনা ও অফিসার ট্রাইব্যুনালের মামলা শুরু হওয়ার বারো বছর পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতি ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের। মধ্য ষাট পর্যন্ত এই সামরিক বিদ্রোহের আয়োজনের সাথে প্রথমদিকে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শেখ মুজিব, মাওলানা ভাসানীসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ

৭. আব্দুর রউফ, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন*, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও কর্নেল (অবঃ) ওসমানী এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে এর পরবর্তী পর্যায়ে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।"[৮]

"১৯৬২ এর দিকে করাচীর মনোরা দ্বীপের হিমালয়াতে বাঙালিদের একটা ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ছিল। বাঙালি নাবিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষেই এই সংগঠনের জন্ম। এর নেতা ছিলেন লিডিং সীম্যান সুলতান। তাঁর সাথে আরো জড়িত ছিল স্টুয়ার্ড মুজিব, সীম্যান নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।..... এই ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ৬ দফার সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। আর এভাবেই যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল নাবিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তা শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাবিত হয়। শুধু নৌ-বাহিনী নয়, সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য শাখার বাঙালি বেশ কিছু সদস্য ও কালক্রমে এই সংগঠন ও আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে নয়, পূর্ব বাংলায় ও ক্রমান্বয়ে এই কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়েছিল"।[৯]

বাংলার স্বাধীনতা কিভাবে কোন পথে আসতে পারে তা নিয়ে দেশ প্রেমিক বাঙালিরা এক সময় ভাবতে শুরু করে। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিরা চিন্তা করছিল সশস্ত্র পন্থাই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার একমাত্র পথ। শুধুমাত্র সশস্ত্র পন্থায় এগুলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে সে চিন্তাও তাদের মধ্যে কাজ করে। তাই তারা একজন বলিষ্ঠ ও সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ;যে নেতৃত্বের গুণে বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে।

বাঙালিদের দৃষ্টি তখন শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে তিনি ইতোমধ্যে নিজেকে বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই স্বাধীনতার চিন্তার সাথে শেখ মুজিবের নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। তাই তারা তাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার বিস্তারিত শেখ মুজিবকে অবগত করলেন। শেখ মুজিব তাদের পরিকল্পনায় সম্মতি দিতে দেরী করেন নাই।[১০]

"বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়েই এই সশস্ত্র পরিকল্পনা এগিয়ে যায়।"[১১] আর সে কারণেই শেখ মুজিবকে মামলার ১নং অভিযুক্ত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয়।

এই গবেষণা কর্ম মোট বারটি (১২) অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার তত্ত্বিক বিন্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(ক) প্রকল্প প্রণয়ন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ;

(খ) গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস;

---

৮. ফয়েজ আহমদ, *'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭।

৯. আবদুর রউফ, সাক্ষাতকার তাং ৩০/০১/০৩, ঢাকা।

১০. অভিযোগনামা ও অভিযুক্তদের সাক্ষাতকার থেকে পাওয়া যায়।

১১. কর্নেল শওকত আলী, সাক্ষাতকার তাং ১৫/০৯/০৩, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত;
(ঘ) গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের এবং অভিযোগ গঠনের বিবরণ বিবৃত করা হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে** ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিচার কার্য পরিচালনা ও অভিযোগ খণ্ডন সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে** এই মামলা দায়েরের পিছনে আইউব সরকারের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে। **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। **সপ্তম অধ্যায়ে** ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পিছনে এই মামলার ভূমিকা কি ছিল সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। **অষ্টম অধ্যায়ে** বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মামলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর একটি উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে। তারপর সংযোজন করা হয়েছে একটি তথ্যপুঞ্জি। সর্বশেষে পরিশিষ্ট (১) এ সংযোজন করা হয়েছে গবেষণা কাজে যে সকল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ, পরিশিষ্ট (২) এ সংযোজন করা হয়েছে মামলার বিবরণ এবং পরিশিষ্ট (৩) এ শেখ মুজিবের জবানবন্দী, যা ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১
গবেষণার তাত্ত্বিক বিন্যাস

ক. প্রকল্প প্রণয়ন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ

১৯৪৭ সালের পাক ভারত বিভক্তির সময় তৎকালীন বাংলা প্রদেশ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে বিভক্ত হয়। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা (পরে পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা নিদারুণ জাতিগত নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। সংগ্রামী জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে এবং বাঙালিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ক্রমে তীব্র হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একক নেতৃত্বে আসীন এবং তাদের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত-প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হন। পাকিস্তানি শাসনামলে তাঁরই নেতৃত্বে বাঙালিদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার ধারণা জন্ম নেয় এবং পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাঙালি সেনা সদস্যদের তা স্পর্শ করে। সকল স্বাধীনতাকামী বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের মুক্তি সনদ ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। এটিকে 'বিচ্ছিন্নতার কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর মোকাবিলায় আইউব সরকার অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দেয়। ১৯৬৭ সালের শেষ এবং ১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে আইউব সরকারের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ১নং আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়, যা "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামে পরিচিত।

এ মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান এবং অপর ৩৪ জন সামরিক ও বেসামরিক চাকুরীরত, চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র পন্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হয়। এ মামলার মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির একক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে এবং ১৯৬৯ সালে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আইউব সরকারের পতন ঘটে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে নতুন সরকার দেশে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের পর্বত-প্রমাণ দেশপ্রেম, অসামান্য বীরত্ব, অদম্য সাহসিকতা, বিপ্লবী উদ্দীপনা এবং সর্বোপরি সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশ স্বাধীন করার দৃঢ় সংকল্প ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।"[১]

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়কে এতকাল পাশ কাটিয়ে ইতিহাস লিখার চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তাই এ মামলার বিভিন্ন দিক আবিষ্কার ও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা আবশ্যক। আর এজন্য প্রয়োজন তথ্যভিত্তিক গবেষণা।

যে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পূর্বশর্ত হলো সমস্যা নিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন। বলা যায় প্রকল্প হলো কোন একটি গবেষণার দিক নির্দেশক। প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ঘটনা পর্যবেক্ষণ পূর্বক গৃহীত কোন প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারন করা হয়। প্রকল্প হচ্ছে গবেষণা ও তত্ত্বের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় যোগসূত্র।

প্রকল্প সম্পর্কে ডঃ সৈয়দ আলী নকী বলেন, "পরিকল্পনা হলো কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে অথবা ভবিষ্যৎবাণী করণ কালে ফলাফল অজ্ঞাত এমন ঘটনা বিষয়ক বিবৃতি যা নাকচযোগ্য করেই উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।"[২]

এই দিকটি বিবেচনায় রেখেই আমি আমার গবেষণা প্রকল্প "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা" এটি প্রণয়ন করেছি।

খ. গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস

বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ পরীক্ষাযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটনার অনুসন্ধান বা ঘটনাগুলির সম্পর্ক আবিষ্কার করে কোন বৃহত্তর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার সু-শৃঙ্খল পদ্ধতিকে গবেষণা বলে।

কোন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে কোন না কোন গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। তেমনি সমাজ গবেষণার জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতির। আর কোন একটি বিষয় তখনই সার্বজনীনতা লাভ করে যখন উহা কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির আওতায় আলোচনা করা হয়। সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজ গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। সমাজ গবেষণায় একই সাথে এক বা একাধিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়।

আলোচ্য গবেষণা কর্মে মূলতঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা, মহাফেজ খানায় রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মামলার

---

১. আব্দুর বাজ্জাক, সাক্ষাতকাব তাং ১১-০৯-২০০৩ ঢাকা।

২. ডঃ সৈয়দ আলী নকী, *সমাজ বিজ্ঞানের পরিসংখ্যান পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারকালীন বিবরণী, মামলায় অভিযুক্ত যারা বেঁচে আছেন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বর্তমান এ গবেষণার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আমি তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে জরীপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। জরীপ পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার উভয় কৌশলে জরীপ করা যায়। আমি প্রশ্নমালা কৌশলটির চেয়ে সাক্ষাৎকার কৌশলটি অধিক ফলপ্রসূ বলে বেছে নিয়েছি। কারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তর দাতাদের নিকট থেকে সরাসরি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এ ক্ষেত্রে উত্তর দাতাকে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনগড়া বা কাল্পনিক মতামত দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। এখানে উত্তর দাতাকে তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে হয়। এর ফলে উত্তর দাতার দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ প্রতিফলনের সম্ভাবনা থাকে। একই সাথে সুযোগ থাকে সীমিত প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উন্মুক্ত মতামত পাবার।

জরীপ পদ্ধতির সুবিধার্থে আমি নমুনায়ন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। নমুনার আকার ১২ জনে সীমাবদ্ধ। এ সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যমূলক। অর্থ ও সময়ের স্বল্পতার কারণেই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী, সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ব্যক্তিগণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লাইব্রেরি পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও বিষয় বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনুসরণ করেছি।

গবেষণার জন্য লাইব্রেরী একটি উত্তম ও প্রয়োজনীয় মাধ্যম। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ কতটুকু করা হয়েছে এবং কতটুকু বাকী রয়েছে সে সম্বন্ধে জানা যায়। এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ব্যবহার করেছি।

আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলার প্রেক্ষাপট একদিনে তৈরি হয় নাই। মামলার অভিযুক্তরা কোন ভাবেই একে ষড়যন্ত্র বলে মেনে নিতে চান নাই। আমরা ষড়যন্ত্র কথাটির বদলে একে গভীর দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে প্রমাণ করার জন্য ধারাবাহিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি।

এ গবেষণার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-অন্তর্নিহিত গভীরতা প্রমাণ করার জন্য তথ্য বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণায় তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে প্রধানতঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি Historical Analytical Method এর উপর নির্ভর করা হয়েছে। ইতিহাসের আলোকে প্রাপ্ত দলিল-পত্র, বিচার-বিশ্লেষণ, যাচাই-বাছাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়েছে। সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের খাতিরে এবং সংগৃহীত তথ্যাবলীর সত্যতা যাচাই করার জন্য সাক্ষৎকার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ মামলা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম প্রধান মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই মামলা সকল শ্রেণী পেশার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার মানুষকে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা বলে ধরে নেয়া যায়। বস্তুতঃ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার দেশপ্রেমমূলক চিন্তা ও পরিকল্পনাই এ মামলায় অভিযুক্তদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ। অভিযুক্তরা গভীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ গর্বিত বাঙালি।

ঘ. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণা কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে তা নকশায় উল্লেখ করতে হয়। একজন গবেষকের সামনে কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, যাকে কেন্দ্র করে গবেষক তার গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেন। কোন তথ্য গবেষক সংগ্রহ করবেন বা কিভাবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করবেন তা গবেষণার উদ্দেশ্য দ্বারাই প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৬৮-৬৯) আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বলা যায় পাকিস্তানি শাসন-নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাঙালিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এখান থেকেই শুরু। এর ফলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিস্ফোরণ ঘটে। মামলার এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'ই বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনে সশস্ত্র পন্থা অবলম্বনের দিকটি নির্দেশ করে। এমনি একটি ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বর্তমান গবেষণা কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো

১। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরা।

২। কি অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে, কি পাকিস্তানি শাসক আইউবের পক্ষ থেকে, এটি কতখানি ষড়যন্ত্রমূলক ছিল, অন্য কথায়, এই মামলার প্রকৃত ভিত্তি বা স্বরূপ কি ছিল তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

৩। মামলার সঙ্গে এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা কিরূপ ছিল তা নিরূপণ করা।

৪। এই মামলার পেছনে আইউব সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তা জানা।

৫। এই মামলার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালিদের মনে 'ভারতভীতি' জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখা।

৬। এই মামলাকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা কিরূপ ছিল তা নিরূপণ করা।

৭। এই মামলা বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কতখানি জাগিয়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল তা চিহ্নিত করা।

৮। সর্বোপরি, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এ মামলার গুরুত্ব ও ভূমিকা কি ছিল তা তুলে ধরা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ২
পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাঙলার বাঙালিরা কার্যত নতুন করে পরাধীনতা বরণ করে। ভৌগোলিক দিক থেকে ২০০০ কিলোমিটার ভারতীয় ভূ-খণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্ম ছাড়া কোন মিল ছিল না। "নৃ-তাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক জীবন ধারায় পূর্ববাংলার মানুষ ছিল পাকিস্তানের চেয়ে ভিন্ন। পাকিস্তানের উভয় অংশের ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র দেশের মানুষের জন্য সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন প্রভৃতির কোনটাই করা সম্ভব হয়নি।"[১]

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরে। ভূ-স্বামী, সামন্ত জমিদার, ধর্মান্ধ উলেমা, পীর, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দ্বারা গড়ে ওঠা এক লুটেরা শাসক ও শোষক শ্রেণী পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হয়ে উঠল।[২] ১৯৪৮ সালে ড. রামমোহন লেহিয়া বলেন, "পাকিস্তান সৃষ্টি সম্পূর্ণ কৃত্রিম। তার দুই অংশের মাঝখানে এক হাজার মাইল ভারতের ভূ-খণ্ড। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্ক টিকতে পারে না। পূর্ব পকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের দাস হয়ে পড়বে; নয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হতে থাকবে।"[৩]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন ছিল পূর্ববাংলার অধিবাসী আর পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছিল শতকরা ৪৪ জন। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাড়তি সুবিধা পেত। প্রথমে করাচি, পরে রাওয়ালপিন্ডি এবং আরো পরে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থাপিত হয়। আর এর জন্য যত খরচ হয়েছিল তা বহন করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট থেকে, সেখানে বাঙালিদের ৫৬% হিস্যা থাকার কথা। কেন্দ্রীয়

---

১. প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২১।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ৬৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানীর কোনো সুবিধাই বাঙালিরা ভোগ করতে পারেনি। পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী হওয়ার কথা ছিল ঢাকা শেরেবাংলা নগরে। দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলার জন্য বরাদ্দ ছিল খুবই সামান্য। বাঙালিরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছিল বলেই সম্ভবতঃ বাঙালিদের দেয়া হয়েছিল দ্বিতীয় রাজধানী। রাজধানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বাঙালিরা ছিল বঞ্চিত। বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রভুসুলভ আচরণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ এবং পাকিস্তানের অর্থনীতি করায়ত্বকরণের ফলে বাঙালিদের মোহভঙ্গ হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ও দাম্ভিক পাকিস্তানিদেরকে অসাম্প্রদায়িক ও স্বাধীন বাঙালিরা পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির সংস্কৃতি তথা ভাষার উপর। সংবিধান প্রণয়নে ও তাদের অস্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়। বাঙালিদের দাবি ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা। বাঙালিদের আরেকটি দাবি ছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধি নির্ধারিত হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কোনমতে এই দাবিগুলো মেনে নিতে রাজী ছিল না। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূলনীতি কমিটির[৪] অর্ন্তবর্তীকালীন রিপোর্টে পূর্ববাংলাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়। এই প্রতিবেদনে দুইটি পরিষদের প্রস্তাব দেয়া হয়। দুই পরিষদকে সমান ক্ষমতা দেয়ার ফলে বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নস্যাৎ হয়।[৫] পাকিস্তানের প্রথম দশক শেষে বাঙালিদের অবস্থান সম্পর্কে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক Keith Callard একটি মূল্যবান মন্তব্য করেন। পরবর্তী ১৩ বছর এই উপসংহার আরো জোড়ালো হয়। Keith Callard এর মন্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ :

> "Whether through Bengali ineffectiveness or the Machiavellian wiles of their opponents Bengali influence had never been decisive. Nazimuddin had been Governor-General, but the real power lay with Liaquat Ali. Nazimuddin became Prime Minister, but lacked force of will, and was ultimately dismissed by the (Punjabi) Governor-General. Mohammed Ali (Bogra) was brought in as Prime Minister but, although a Bengali, he remained the captive of the West Pakistan group that provided the main strength of his government. The Bengali members attempted to use their majority to diminish the powers of the Governor-General, but as a result they found themselves out of their jobs. The electorate of East Bengal had

---

৪. ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ গণপরিষদে ভবিষ্যৎ মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরির উদ্দেশ্যে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। যা 'মূলনীতি কমিটি' নামে অভিহিত। বিস্তারিত, ড. হারুন আর রশীদ, *বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০০-২০১।

৫. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

repudiated the Muslim League, but the outcome was rule for more than a year by West Pakistan bureaucrats. The armed forces were West Pakistani, the national civil service was predominantly West Pakistani, and trade and industry were largely in the hands of non-Bengalis. It is in some such terms as these that most Bengalis view the history of the first ten years of Pakistan. In consequence, despairing of equality on a national basis, they turned increasingly to proposals for home rule for their own province."[৬]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পাহাড় সমান ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি পাকিস্তানিদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাঙালিদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকেরা জোর করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। উর্দুর পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবও পশ্চিম পকিস্তানিরা মেনে নেয়নি। তারা পূর্ববাংলার মুসলমানদের নিচু জাতের বলে জ্ঞান করতো। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার মর্যাদাকে গুরুত্ব না দিয়ে বা বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধি জানার বা বুঝার চেষ্টা না করে বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে একে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পথ হিসেবে দেখতো। এই জাতিবিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আইয়ুব খান নিজেও বাঙালিদের সম্পর্কে কটু বাক্য উচ্চারণে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি তাঁর দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এরকম উচ্চারণও করেন যে, জাতিগতভাবেই বাঙালিরা নিচু শ্রেণীর।[৭]

এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায় রাও ফরমান আলীর লেখায়। "পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররাও বাঙালি অফিসারদের সাথে বড় একটা মেশেন না। ঢাকা ইউনিটে ২-৩ জন বাঙালি অফিসার ছিলেন। তারা অনেকটা আলাদাভাবে থাকতেন। মেসে তারা আলাদা খেতেন। আমি অনেক চেষ্টা করতাম এরা মিলে-মিশে চলুক। কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।"[৮] তিনি আরো বলেন, "দীর্ঘদিনের বঞ্চণা বাঙালিদের মন-মানসিকতাই গড়ে তুলেছিল অন্য ধাঁচে।--পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর লোক রটনা করে বেড়াতো বাঙালিরা ভুখা-নাঙ্গা, আনকালচারডও। প্রায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা তাদের সহায়-সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর তাদের চাল-চুলো ঠিক করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে মদদ যোগাতে হয়।"[৯]

---

৬. Keith Callard, *Pakistan : A Political Study*, George Allen and Unwin London, 1957, P. 173.

৭. Ayub Khan, *Friends Not Masters*, Oxford University Press, Lahore-1967, P. 187.

৮. অনুবাদ-মোস্তাক হাকুন, *রাও ফরমান আলীর ডাইরী অবলম্বনে ভুট্টো, শেখ মুজিব ঃ বাংলাদেশ*, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৮।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চ পর্যায়ে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা, যারা সবদিক থেকেই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী। তারা ছিল প্রশাসনের একচ্ছত্র অধিকারী। রাজনীতিবিদদের তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয়জ্ঞান করতে দ্বিধা করতো না। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য তো ছিলই, একই সাথে পূর্ববাংলার প্রশাসনে অবাঙালি আমলাদের বসানো ছিল তাদের অন্যতম নীতি। সচিবালয় থেকে শুরু করে তৎকালীন মহকুমা পর্যন্ত সকল উচ্চ পদে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারগণ আসীন ছিল।[১০]

সশস্ত্র বাহিনীতেও বাঙালিদের সংখ্যা বা আনুপাতিক উপস্থিতি ছিল খুবই কম। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও এক্ষেত্রে বাঙালিদের দেয়া হতো না।[১১]

কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল পূর্ববাংলার স্বার্থের পরিপন্থী। পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে তারা কখনই আন্তরিক ছিল না। পাকিস্তানের প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার কথা যদিও উল্লেখ করা হতো কিন্তু প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো পূর্ববাংলায় কখনো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই। ভৌত কাঠামো গড়ে তোলার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রয়োজন ছিল তা থেকেও বঞ্চিত ছিল পূর্ববাংলা।[১২]

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সামরিক খাতে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ হতো, কিন্তু তার সামান্য অংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়তো। এর ফলে রাজস্বের অর্ধেকেরও বেশি ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও আমলা প্রভুদের স্বার্থে। ফলে পাকিস্তানের সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয় দারুণভাবে।[১৩] বৃটিশ উপনিবেশ থাকাকালে পূর্ববাংলার জনগণের আর্থিক অবস্থা যতটা খারাপ ছিল, পাকিস্তান রাষ্ট্রের এক দশকের মধ্যে এ অঞ্চল পূর্বের অবস্থার চেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি বিপর্যস্ত ও পিছিয়ে পড়ে। সরকার সৃষ্ট বৈষম্যের কারণে উভয় অংশের অর্থনৈতিক ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নের সারণিতে তা লক্ষ্য করা যাবে।

---

১০. মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ ঃ *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, অনুবাদ জগলুল আহমদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২, ঢাকা, সারণি-১৩, পৃ. ১৩।

১১. পূর্বোক্ত, সারণি-৮, পৃ. ১৩।

১২. পূর্বোক্ত, সারণি-৬, পৃ. ১২।

১৩. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*,সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, সারণি-৩.১, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি

Some Economic Indicators

Item	Period	East Bengal	West Pakistan
GNP Growth Rate in Pakistan Five year Plan Allocations-Public Sectors (Annual Average)	1959-1970		5.6%
1st	1955-1960	38%	62%
2nd	1960-1965	45%	55%
3rd	1965-1970	52%	48%
Private Investment	1963-1964	21%	79%
	1967-1968	22%	78%
Development Expenditure	1950-1955	20%	80%
	1960-1963	5.4%	64.6%
	1965-1970	36%	64%
Export Earnings	1958-1968	59%	41%
Import Expenditurtes	1958-1968	30%	70%
Inter wing trade (Exports)	1964-1969	Rs. 3174 million	Rs. 5,292 million
Industrial Assets owned by Bengalis	1948-1970	11%	
Resources Transferred (East to West)	1948-1969	$ 2.6 million	
Inter wing GDP Edge (Favourable to West)	1968-1969	34%	
Inter-wing Difference in Per Capital Income Official (Favourable to West)	1959-1960	32%	
	1964-1965		
	1968-1969		
Real Difference in Per Capital Income (Favourable to West)	1968-1969	95%	
Real difference in Average Standard of Living (Favourable to East)	1968-1961	26%	

উৎস ঃ ড. হারুন অর রশিদ, *বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি সরকার ও শাসণতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেসন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৫৫। Table-5.

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। প্রদেশ ছিল অর্থ ও সম্পদের যোগানদার। বলা হতো, কেন্দ্রের জন্য ব্যয় করা হলে তার সুফল পাকিস্তানের উভয় অংশ ভোগ করবে। এভাবেই পূর্বাঞ্চলের সম্পদ পাচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে।[১৪] রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। "আয়ের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তান ব্যয়ের মাত্র এক পঞ্চমাংশের উপকার লাভ করে।"[১৫]

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-১০২।

১৫. পূর্বোক্ত পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কিছু সুদৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করা হয় এবং সে লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপও নেয়া হয়। কিন্তু সামরিক শাসকের দাম্ভিক সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় কয়েকগুণ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বাজেট বরাদ্দে প্রতিরক্ষা খাত পেতে থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। যার ফলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের পরিকল্পনা বাতিল হয়।[১৬]

পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ক্ষমতালোভী আমলারা এমনভাবে তৈরি করতো যাতে পূর্ববাংলার প্রতি শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যায়। পাকিস্তানের ২০ বছরের পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা তা লক্ষ্য করবো।[১৭]

বিভিন্ন অর্থায়ন সংস্থা অর্থায়ন করতো করাচি ও পশ্চিম পাকিস্তানে। এক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান ছিল ভীষণরকম পিছিয়ে।[১৮] স্বাস্থ্য সার্ভিস খাতেও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। এখানে জনসংখ্যার তুলনায় স্বাস্থ্য সেবা খাতে বরাদ্দ ছিল খুবই সামান্য।[১৯]

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক আমলাদের কর্তৃত্ব ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে।। তারা সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে নিয়োজিত ছিল। আইউব শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরদের মধ্যে ২ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের, আর দুইজন ছিলেন বাঙালি, যার মধ্যে একজন পুলিশের আইজি অপরজন আইউবের একান্ত কাছের মানুষ আব্দুল মোনায়েম খান। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়গুলোতে আইউবের বশংবদরাই দিনের পর দিন অধিষ্ঠিত ছিল।[২০] ভূমির মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের দখলে। অপরদিকে পূর্ববাংলায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ও জমির মালিকানা দুইই ছিল কম।[২১]

"পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে উভয় অঞ্চলের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য গড়ে ওঠে তা যেমন ছিল বেদনাদায়ক, তেমনি বিস্ময়কর।[২২] কিন্তু পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরের ইতিহাসে সংকীর্ণ ও গোষ্ঠী স্বার্থের দোসর আমলারা তা সমাধানের চেষ্টা না করে ভুল নীতি ও কুটকৌশলের দ্বারা সার্বিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে, যার কারণে স্বাধীনতার পরপরই পূর্ব বাংলায় সর্ব পর্যায়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। (যেমন কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক ধর্মঘট, সরকারি কর্মচারীদের অসন্তোষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, ছাত্র বিক্ষোভ ইত্যাদি।) মুসলিম লীগের

---

১৬. পূর্বোক্ত পৃ. ১০৪, সারণী-৪.২।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০, সারণি-৪.১১।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২, সারণি-৪.১২।
১৯. মওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯, সারণি-৮।
২০. ড. হারুন অর রশিদ, *পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭।*
২১. মওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. সূচনা-১১, সারণী-৪।
২২. ডঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫।*

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগপূর্ণ নেতৃত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার কারণে তারা মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে আওয়ামী লীগ (১৯৪৯) ও কৃষক শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩) গঠন করে। এভাবেই ক্রমশঃ পরিস্থিতি পূর্ব বাংলার জনগণের মনে অসহায়ত্বের সৃষ্টি করে এবং "বিচ্ছিন্নতাবোধের" জন্ম দেয়। [২৩]

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকেই পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় বাঙালিদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, যা পাকিস্তানের সামরিকতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্র স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় থাকার পর পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ষড়যন্ত্রের জাল বুণে বাঙালিদের ক্ষমতাচ্যুত করে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে অন্তরীণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানসহ শত শত নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয়। পূর্ববাংলার জনগণের অসন্তোষ ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, পেশা নির্বিশেষে সকলকে একই রাজনৈতিক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করা এবং পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে আন্দোলনে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগের' 'মুসলিম' শব্দটিকে বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল দল হিসেবে 'আওয়ামী লীগ' পুনর্গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জাকে কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবাহিনী প্রধান আইউব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সামরিক শাসনের আওতায় সংবিধান স্থগিত ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। উভয় অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

ক্ষমতারোহণ করেই আইউব দেশে সংবিধান প্রণয়নের ছলে একনায়কতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে লাগলো। আইউবের অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনামলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংসদ বাতিল করা হয়। ষাটের দশকের শুরু থেকেই আইউবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬২ সালে আইউব খান জাতিকে একটি মনগড়া ও স্বৈরতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দেয়, যা ছিল গণতন্ত্রের খোলসে গণবিরোধী। আইউবের মৌলিক গণতন্ত্র বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র (Basic Democracies) রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্থাসমূহকে উচ্চ থেকে নিম্নে পাঁচস্তর পিরামিড আকৃতির কাঠামো করার বিধান করা হয়। ঐ পিরামিডের শীর্ষে থাকবেন দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সর্ব নিম্নস্তরে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ। পিরামিডের একমাত্র নিম্ন স্তরটিই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে বলে ব্যবস্থা করা হয়। "পরে তাদের ভোটে নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ। জেলা কাউন্সিল ইত্যাদি মধ্যস্তরের পরিষদগুলোতে নিম্নস্তর থেকে নির্বাচিত সদস্যদের সাথে সরকারি কর্মকর্তারা পদাধিকার বলে সদস্য তথা নিয়ন্ত্রক হবেন। এভাবে পরোক্ষ ভোটে ও

---

২৩. এডভোকেট সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা-প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

মনোনয়নের মিলিত প্রক্রিয়ায় সমগ্র কাঠামোটি আসলে প্রেসিডেন্টের এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে।"[২৪]

বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার খেলায় মেতে উঠলেন আইউব। তাঁর ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর PRODO (Public Representative Office Disqualification Order)[২৫] সরকারি পদলাভে অযোগ্যতা সংক্রান্ত আদেশ এবং ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট EBDO (Elective Bodies Disqualification Order)[২৬] নামে দুটি অধ্যাদেশ জারি করে আইউব তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ পূর্ব পাকিস্তানের অনেক অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয় নেতা এভাবে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অযোগ্য ঘোষিত হলেন।[২৭] Rounaq Jahan এ প্রসঙ্গে বলেন, "Basic Democracies, the first institution of the Ayub regime and the backbone his new political system was organized on a national basis. It was a four-tier system of local government. The lowest tier consisted of eighty thousand Basic Democrats-forty thousand from each wing-who were directly elected and who formed the electoral college for the presidential and assembly elections.[২৮]

১৯৬৪ সালে আইউব খান দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলি স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করে এবং নির্বাচনের ব্যাপারে তারা আশাবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু আইউব সরকার অগণতান্ত্রিক উপায়ে বিজয়ী হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সকল পথ বন্ধ করে দেয়। গণতন্ত্রপ্রিয় পূর্ববাংলার মানুষ ফুঁসে উঠতে থাকে। আর এ গণঅসন্তোষ চাপা দেয়া এবং আন্দোলনমুখী জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার জন্য ভারতের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়।[২৯] "অনেকের মতে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের মূলে ছিল প্রেসিডেন্ট আইউবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।"[৩০]

বাঙালিদের জন্য ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১৭ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানেরই পরাজয় ঘটে। "এ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দেয়া তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণিত হয়। এমনই এক পটভূমিতে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের পক্ষে 'আমাদের বাঁচার

---

২৪. প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪। আরো ড. হারুন অর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩।

২৫. প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

২৬. ড. হারুন আর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯।

২৭. প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

২৮. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics : Problems and Issues*, University Press Limited, Bangladesh, 1980, P. 11-12.

২৯. সেলিনা হোসেন, *উনসত্তরের গণআন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫।

৩০. ড. হারুন আর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

দাবী ৬ দফা' কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাই, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালিদের নিজ পায়ে দাঁড়াতে তাগিদ দেয় এবং তা আমাদের পরবর্তী স্বাধীনতার সংগ্রামকে প্রভাবান্বিত করে।"[৩১]

একমাত্র ঔপনিবেশিক দেশই তার কোন উপনিবেশের প্রতি এমন অবিচার, শোষণ ও আধিপত্য চালাতে পরে। ভারত সরকারের প্রকাশিত Bangladesh Documents এ তাই যথার্থ মন্তব্য করা হয়েছে :

> East Pakistan existed only for the benefit of the West Pakistani capitalist merchants, industrialists and contractors, for the militarists and civil bureaucrats. For the last 24 years Pakistan Government, manned mostly by west Pakistanis dominated the state policy aiming to develop the barren deserts of West Pakistan by a deliberate policy which impoverished East Pakistan.[৩২]

---

৩১. ড. হারুন আর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

৩২. *Bangladesh Documents*. Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, 1971, P. 16.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৩
মামলা দায়ের ও অভিযোগ গঠন

মামলা দায়ের

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় সি.এস.পি, অফিসার, সমারিক বাহিনীর কয়েকজন কর্মরত এবং প্রাক্তন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বেসামরিক নাগরিকের গ্রেপ্তার সম্পর্কে ব্যাপক কানাঘুষা চলতে থাকে। ঐ মাসের শেষার্ধে গ্রেপ্তারকৃত কামালউদ্দীন আহমেদ ও সুলতানউদ্দীন আহমেদ নামক সাবেক সামরিক কর্মচারীর পক্ষ হতে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের অভিযোগ করে ঢাকা হাইকোর্টে রীট পেশ করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট আটক ব্যক্তিদ্বয়কে অবিলম্বে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর এবং তাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ পরীক্ষা করার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন।

০১-০১-১৯৬৮ তারিখে সর্বপ্রথম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রেসনোটের মাধ্যমে কয়েকজনকে গ্রেফতারের সংবাদ পরিবেশন করে। সংবাদটি ০২-০১-১৯৬৮ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১] ৬ জানুয়রি ১৯৬৮ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত এক প্রেসনোটে[২] এ কথা বলা হয় যে, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পূর্ব পাকিস্তানে উদঘাটিত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দুইজন সি.এস.পি অফিসারসহ ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৮ ই জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র দফতরের অন্য একটি প্রেসনোটে[৩] এ কথিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়। অতঃপর পূর্বে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারকৃত এই সব সামরিক ও বেসামরিক লোকদের দেশরক্ষা আইনের পরিবর্তে ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে আর্মি, নেভী এন্ড এয়ার ফোর্স আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।[৪]

মোট ১০০ অনুচ্ছেদ সম্বলিত মামলাটি তৈরি করতে সরকার দীর্ঘ সময় নেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য কাগজপত্র, দলিলপত্র, নথিপত্র এবং যে কোন রকমের প্রমাণ

---

১. Colonel Shawkat Ali, *Armed quest for Independence*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, P. 107. আরো *Daily Azad* ০২-০১-১৯৬৮, ন্যাশনাল আর্কাইভস, বাংলাদেশ।

২. Colonel Shawkat Ali, *Ibid*, PP. 108-111. আরো, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৯৮-৩০০।

৩. Colonel Shawkat Ali, *Ibid*, P. 112. *আরো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

৪. Colonel Shawkat Ali, *Ibid*, P. 112.

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহার্থে গোপনে সরকারি অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়। জানুয়ারি মাসে সরকার এ ব্যাপারে প্রথম বিবৃতি দেয়ার আগে অভিযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিকেই আটক করা হয়। কয়েকজন ছাড়া বাকী সবার উপর স্বীকারোক্তি আদায় এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহার্থে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অশেষ নির্যাতন চালানো হয়। প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবার পরিজনদের পেছনে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন লাগানো হয় যাতে তারা যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে গিয়ে অভিযোগমূলক তথ্য সংগ্রহে দিনের পর দিন কাজ করেন। "কেবল এই মামলার ভিত্তি প্রস্তুত করতে পাকিস্তান সরকারের ব্যয় হয় দশ লক্ষাধিক রুপী।"[৫]

অভিযোগ গঠন

১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার কার্যের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনকল্পে ফৌজদারী আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারী করা হয়। সে অধ্যাদেশের ৫ ধারা মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন তারিখে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত আকারে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের বিবরণ[৬] এখানে তুলে ধরা হলো।

গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণে এমন একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটন করা হয় যার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ ব্যবহার করে পাকিস্তানের একাংশে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়।

ঐ সকল ব্যক্তিদের কয়েকজনের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত তথ্য প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের ছদ্মনাম ব্যবহার করে। একটি ডি. ডে. (Day Fixed for Operation) তে করণীয় ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা অনুরূপ ছদ্ম শব্দাবলী ব্যবহার করে। তাদের প্রধান পরিকল্পনা ছিল সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্র-শস্ত্র দখল করে তাদেরকে অচল করে দেয়া। কমান্ডো স্টাইলে অভিযান চালিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এই ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারমধ্যে একটি সভায় ঐ অভিযান কার্যকারী করার দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের এবং ভারতীয় পক্ষের যারা অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে এই ষড়যন্ত্রকে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

---

৫. মওদুদ আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩।

৬. আবদুর রউফ, *আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬-১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এই মামলায় এক নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমান করাচী সফর করেছিলেন। এই সফর কালে তিনি পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন (পরে লেঃ কামান্ডার) ও আসামী নম্বর ২ কর্তৃক আহুত একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৪ সালের শুরুতে তাঁর নিজ বাসভবন বাংলো নং ডি/৭৭, কে, ডি. এ স্কীম নং ১, করাচিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই অভিযোগ নামার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ৪নং আসামী নাবিক সুলতানউদ্দীন আহমেদ, ৫নং আসামী নাবিক নূর মোহাম্মদ এবং ১নং সাক্ষী লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, পূর্ব পকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একটি বিপ্লবী সংগঠন সংগঠিত করার বিষয়ে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়- এই মামলার ২নং সাক্ষী কামাল উদ্দীন আহমদের বাসায়, যার ঠিকানা : ৩/৪৮, এম.এস.পি.পি স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (মালামাআবাদ নামে বহুল পরিচিত), করাচি।

এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গরা হলেন :

১। শেখ মুজিবুর রহমান	--	আসামী নং-১
২। কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	--	আসামী নং-২
৩। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান	--	আসামী নং-৩
৪। সুলতান উদ্দিন আহমেদ	--	আসামী নং-৪
৫। নূর মোহাম্মদ	--	আসামী নং-৫
৬। মিঃ আহমদ ফজলুর রহমান	--	আসামী নং-৬
৭। মোজাম্মেল	--	সাক্ষী নং-১

১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৪-৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পুনরায় করাচী সফর করেন এবং ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি সেখানে অবস্থান করেন। ঐ সময় কালের মধ্যে একদিন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের পূর্বোক্ত বাসভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন :

১। শেখ মুজিবুর রহমান	আসামী নং-১
২। কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	আসামী নং-২
৩। নূর মোহম্মদ	আসামী নং-৫
৪। এ.এফ. রহমান (সি.এস.পি)	আসামী নং-৬
৫। ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহাফিজুল্লাহ	আসামী নং-৭
৬। লেঃ মোজাম্মেল হোসেন	সাক্ষী নং-১

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান গোপন সংগঠনের তৎপরতা চালানোর জন্য সংগঠনের কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের অনুরোধে একে একে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতান ছুটি নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। তাদের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবও ৪নং আসামী সুলতানের মাধ্যমে ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি সভার আয়োজন করে।

উক্ত সভা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে বিকেল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত সদস্যরা ছিলেন :

১। শেখ মুজিবুর রহমান	আসামী নং-১
২। কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	আসামী নং-২
৩। স্টুয়ার্ড মুজিব	আসামী নং-৩
৪। সুলতান উদ্দিন আহমেদ	আসামী নং-৪
৫। রুহুল কুদ্দুস সি.এস.পি	আসামী নং-১০
৬। আমীর হোসেন	সাক্ষী নং-৩

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম সফর করেন এবং লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভার পরে তিনি ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের বাসা-১২ রফিকউদ্দীন সিদ্দিকী বাইলেন, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম ঠিকানায় গ্রুপের একটি সভা ডাকেন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা ছিলেন :

১। শেখ মুজিবুর রহমান	আসামী নং-১
২। স্টুয়ার্ড মুজিব	আসামী নং-৩
৩। মানিক চৌধুরী	আসামী নং-১২
৪। সাইদুর রহমান	সাক্ষী নং-০৭

এই সভায় ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে গ্রুপের সভার জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেন।

১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান একটি গোপন সভা আহবান করেন। দিনটি ছিল শনিবার। ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের জন্য এই দিনটি সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ চাকরীস্থল থেকে ছুটি না নিয়েই তিনি সপ্তাহান্তে ঢাকায় গিয়ে সভায় যোগদান করতে পারেন। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ তাজউদ্দিন আহমদের (আওয়ামী লীগ নেতা ও পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী) বাসা নং ৬১৭, রোড নং-১৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, সভা শুরু হয়। তাজউদ্দিন আহমদ ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন। তিনি এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু তিনি নিজে এই সভায় উপস্থিত থাকেন

Dhaka University Institutional Repository

নি। এই সভায় অংশগ্রহণকারীদের ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান একটি বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পূর্বোক্ত বাড়িতে যান। এই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন :

১। শেখ মুজিবুর রহমান	আসামী নং-১
২। কর্নাডার মোয়াজ্জেম হোসেন	আসামী নং-২
৩। স্টুয়ার্ড মুজিব	আসামী নং-৩
৪। রুহুল কুদ্দুস (সি.এস.পি)	আসামী নং-১০
৫। আমীর হোসেন	সাক্ষী নং-৩

অভিযোগে আরো বলা হয় যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বোক্ত গ্রেফতার বরণের পরে তিনি যে রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ) সদস্য সেই দল তার বাসভবনে ১৯৬৬ সালের ২০ মে একটি জরুরী সভার আয়োজন করে। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এই সভায় যোগদান করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসেন। সভায় যোগদান করার পূর্বে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে নিয়ে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ পি.এন.ওঝার অফিসে যান। মিঃ পি. এন. ওঝা সাইদুর রহমানের পরিচয় ইত্যাদি লিখে রাখেন। এবং পরে আবার মাঝে মাঝে ওখানে যাবার জন্য বলেন। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সেখান থেকে বের হয়ে আসার পরেও ১২নং সাক্ষী আসামী মানিক চৌধুরী অনেকক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন।

এই সভা সমূহে গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যের কাজ ভাগ করে দেয়া হয় এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোহর ও চট্টগ্রাম সেনা নিবাস এবং চট্টগ্রাম নৌ ঘাটির ম্যাপ মূল্যায়ন করা হয় এবং আরও বেশী অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়।

১৯৬৬ সালের জুন মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির তাঁর বাসায় ১২নং সাক্ষী রমিজকে একটি ডায়েরী, একটি নোটবুক এবং একটি ফোল্ডার দিয়ে সেগুলি পড়তে বলেন। এই সমস্ত প্রমাণপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের রূপরেখা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা ছিল।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে ৭নং সাক্ষী সাইদুর রাহমানের সঙ্গে চট্টগ্রামের এক বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেনের হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়। সেখানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের কাছে প্রকাশ করেন যে, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী গ্রেফতারের আগেই অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারির কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দেবার কথা ছিল। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন এরপর ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি মিঃ পি.এন.ওঝাকে চিনেন কিনা। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। ফলে ২নং আসামী মোয়াজ্জম হোসেন তাকে অনুরোধ করেন মিঃ পি.এন.ওঝার

Dhaka University Institutional Repository

কাছে অস্ত্র-শস্ত্রের একটি তালিকা পৌছে দেবার জন্য। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি হিসেবে তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে ঐ কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের কোন এক সময় ২৬নং আসামী শওকত আলী ঢাকা সফর করেন এবং ১৩নং সাক্ষী আলীমের সঙ্গে অর্ডিন্যান্স মেসে অবস্থান করেন। ঐ সন্ধ্যায়ই ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের পূর্বোক্ত মেসে ১৩নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬ নং আসামী শওকত আলীর সঙ্গে দেখা করেন। ঐখানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, আগামীকাল সকালে ১২নং সাক্ষী রামিজের মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের বাসায় তিনি একটি সভা আহবান করেছেন। এই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন :

১। কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	আসামী নং-২
২। ষ্টুয়ার্ড মুজিব	আসামী নং-৩
৩। সুলতান উদ্দিন আহমেদ	আসামী-৪
৪। নাজমুল হুদা	আসামী নং-২৭
৫। শওকত আলী	আসামী নং-২৬
৬। আলীম	সাক্ষী নং-১৩

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান দ্বিতীয় বারের মত ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ পি.এন.ওঝার মধ্যে পূর্বোক্ত বাড়িতে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মিঃ পি.এন.ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেনকে বলেন যে, ভারত সরকার তাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে এবং তিনি ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেনকে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ যথা সময়ে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন।

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ১৯নং আসামী সামসুর রহমানের পরামর্শে গ্রুপের প্রতি প্রাক্তন সামরিক অফিসারদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের চট্টগ্রামের বাসা 'এ্যাংকারেজ'-এ এক সভা আহবান করেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী এই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন।

আগরতলায় প্রেরিত প্রতিনিধি দলটিকে (ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ৩নং অভিযুক্ত, মোহাম্মদ আলী রেজা ৩৩নং অভিযুক্ত) ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই রাত ২.৩০ মিঃ থেকে ৪.৩০ মিনিটের মধ্যে পি, আই, এ, র স্টাফ কারে করে ফেনী জেলার পরশুরাম থানা ভারত সীমান্ত (বাংলাদেশ) হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বেলোনিয়া থেকে পাকিস্তানের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌছে দেয়। এরপর ১২নং সাক্ষী রমিজ এবং ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন ঐ রাতেই চট্টগ্রাম ফিরে আসে। ১৭নং সাক্ষী জালালউদ্দিন প্রতিনিধিদ্বয়ের ভারতীয় স্থলভাগের প্রবেশ তদারক করেন।

১৯৬৭ সালের ১৩ জুলাই রাতে কোনো এক সময় ঐ প্রতিনিধিদ্বয় ৩৩নং আসামী রেজা এবং ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব আগরতলা থেকে একটি ট্রাকে করে ফেনীতে হোটেল ডিনোফায়

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে আসেন। ১৯৬৭ সালের ১৫ জুলাই ২নং আসামী মোয়াজ্জেম হোসেনকে উক্ত সভার ফলাফল জানানোর জন্য তারা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ৩৫নং আসামী লেঃ আব্দুর রউফ ২৯নং আসামী জলিলের ক্লেটন কোয়াটার্সের বাসায় একটি জরুরি সভা আহবান করেন। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১। মাহফিজউল্লাহ্	আসামী নং-৭
২। মাহফুজুল বারী	আসামী নং-২২
৩। আব্দুল জলিল	আসামী নং-২৯
৪। লেঃ রহমান	আসামী নং-৩১
৫। লেঃ রউফ	আসামী নং ৩৫
৬। শামসুদ্দিন	সাক্ষী নং-০৬
৭। সিরাজ	সাক্ষী নং ১৫

৩২ নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হকের পরামর্শে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ১৭ নং আসামী জহুরুল হক চাকলালা পি.এ.এফ স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তিনি ২১ নং সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেনের সাক্ষাৎ পান। ১৭ নং আসামী জহুরুল হক ২১ নং সাক্ষী রজব হোসেনকে জানান যে সামরিক-বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি গ্রুপ গঠিত হয়েছে। তিনি ২নং সাক্ষী রজব হোসেনকে সেই গ্রুপে যোগদানের আহবান জানান। কিন্তু ২১ নং সাক্ষী রজব হোসেন এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করতে অস্বীকার করেন।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ ১৫ নং সাক্ষী সিরাজের বন্ধু জনৈক মালিকের ঢাকাস্থ শুক্রাবাদের বাসায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ একটি সভায় মিলিত হন :

১। লেঃ রউফ	আসামী নং-৩৫
২। মাহবুব উদ্দীন	আসামী নং-৩০
৩। সিরাজ	সাক্ষী নং-১৫

এবং আরো কয়েকজন, যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় নি। এই সভায় গ্রুপের কর্মকাণ্ডকে আড়াল করে রাখার জন্য ঢাকায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি আলোচনা হয়। ৩৫ নং আসামী লেঃ রউফ গ্রুপের কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার উদ্যোগ নেন।

এর অল্প কয়েকদিন পরই গ্রুপের সদস্যদের গ্রেফতার করা আরম্ভ হয় এবং এইভাবে তাদের কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হয়।[৭]

উৎস ঃ ফয়েজ আহমেদ, 'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯-১১৪।

---

৭. সরকার প্রদত্ত অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ, পরিশিষ্ট-২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৪
ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিচারকার্য পরিচালনা ও অভিযোগ খণ্ডন

প্রথমে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতারকৃত এই সব সামরিক ও বেসামরিক লোকদের দেশরক্ষা আইনের পরিবর্তে ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে আর্মি, নেভী এন্ড এয়ারফোর্স আইনে পুনরায় গ্রেফতার করে সেন্ট্রাল জেল থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়।[১]

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রথম থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি যেমন ISI (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টিলিজেন্স) এবং CIB (সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো) মামলার তদন্তকার্য পরিচালনা করে। ISI ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা এবং CIB ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ। মামলায় অভিযোগ প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সেনা বাহিনীর সদর দপ্তরের JAG (জাজ এডভোকেট জেনারেল) ব্রাঞ্চকে। তারাই আনুসঙ্গিক কাগজপত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরি করেছিল, যা পরবর্তীতে সরকার পক্ষ ট্রাইব্যুনালে হাজির করেছিল। শুরুতে একটি মিলিটারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সকল আসামীদের বিচার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা করতে হলে প্রচলিত আইনের অনেক সংশোধন প্রয়োজন হতো। কারণ প্রচলিত আইনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের এবং বেসরকারি লোকদের একসঙ্গে বিচার করা সম্ভব ছিল না। আইউব খান তাই মিলিটারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রস্তাব প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু তাতে আইউব খানের অসৎ উদ্দেশ্য বাঙালিদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে ভেবে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের প্রস্তাব বাতিল করা হয়। পরে তিনজন বেসামরিক বিচারক নিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।[২]

১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) ১৯৬৮ (অর্ডিন্যান্স নং-৫-১৯৬৮) বলে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস.এ. রহমানের নেতৃত্বে ও বিচারপতি জনাব মুজিবুর রহমান খান ও বিচারপতি জনাব মুকসুমুল হাকিমকে নিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন।[৩] আইউব খান ঝুঁকি নিতে চাননি তাই শাস্তি নিশ্চিত করতে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির এবং সাক্ষ্য আইনের অনেকগুলি

---

১. Colonel Shawkat Ali, *op. cit.*, P. 112. আরো, *কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রেসনোট*, দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮, আরো *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

২. Colonel Shawkat Ali, *Ibid*, PP. 88-90.

৩. *Ibid*, P. 90.

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনী এনে বিশেষ ট্রাইবুন্যালকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন সুযোগ ছিল না। এই ট্রাইব্যুনালের উপর কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তির বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মাধ্যমে যে ৩৫ জনকে মামলার আসামী করা হয় তারা ছাড়া মোট ১১ জন রাজসাক্ষী হতে রাজী হওয়ায় তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয় যাতে মামলার সাক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক শাস্তি যেন নিশ্চিত হয়। ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারকে লাহোর হাইকোর্ট থেকে আনা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও রেজিস্ট্রার উভয়ই ছিলেন পাঞ্জাবী।[৪]

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল যদিও একটি বেসামরিক কোর্ট ছিল কিন্তু এর যাবতীয় পরিবেশ ছিল সামরিক আদলে। এর আদালত কক্ষ স্থাপন করা হয়েছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সেনাবাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কাজ করতো। অভিযুক্তদের এবং বেশ কয়েকজন সাক্ষীকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল। এসব আয়োজন দেখে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল যে, বিচারের নামে একটি প্রহসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য পরিচালনা করে বাঙালিদের বিপক্ষে রায় দেয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে।[৫] এতে কেবল প্রতিষ্ঠিত আইনই পরিবর্তিত হয় নি বরং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিদারুণ অসুবিধায় ফেলে দেয়। ফলে এর দ্বারা ন্যায় বিচার হবে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ দেখা দেয়। এ সমস্ত বিধান দেশের উভয় অংশের বার এসোসিয়েশনে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে এই বিধান সংশোধনের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পিটার হ্যাজেল হার্স্ট ঢাকা থেকে এই আইনের সমালোচনামূলক প্রতিবেদন লন্ডনের *'দি টাইমস*, পত্রিকায় প্রকাশ করলে তা প্রথমবারের মতো বর্হিবিশ্বের গোচরে আসে। এ ছাড়াও অধ্যাদেশের আরো কতগুলো বিধান ছিল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আইনও পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। সেগুলোর মধ্যে জামিনের-অধিকার, আপীল, জুরী কর্তৃক বিচার পক্ষ বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। এ সমস্ত বিধানের সমালোচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা জনগণের নজরে আসে।[৬]

বিচারকার্য :

১৯ জুন ১৯৬৮ বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও রেডিও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে ভারতের অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যপুষ্ট হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে

৪. *Ibid.* PP. 88-90.

৫. *Ibid.* PP. 90-91.

৬. মওদুদ আহমেদ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান)-কে বিচ্ছিন্ন করা সম্বন্ধীয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বা 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' এতে অভিযুক্তদের শুনানী শুরু হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভিযোগ আনয়ন করা হয়।' পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের সহ বেশ কিছু সংখ্যক আইনজীবী সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য উপস্থিত হন।

বিবাদীপক্ষ সমর্থন করেন বৃটিশ আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস কিউ. সি, ড. আলীম আল রাজী, আব্দুস সালাম খান, ব্যারিস্টার কে. জেড. আলম, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, খান বাহাদুর ইসমাইল, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন, আতাউর রাহমান খান, জহিরুদ্দিন, জুলমত আলীসহ বহু সংখ্যক আইনজীবী। যুক্তরাজ্যের দেশপ্রেমিক বাঙালিরা স্যার টমাস উইলিয়ামকে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য ইংল্যান্ড থেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর আগমনের খবর অভিযুক্তদের এবং সমগ্র বাঙালি জাতির সাহস জুগিয়েছিল। অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, মামলাটি শুধু কোর্ট রুমেই পরিচালিত ও সীমাবদ্ধ থাকবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মামলার প্রচার যাতে কাজে লাগে সেভাবেই মামলা পরিচালিত হবে এবং দেশের বাইরে ও ভিতরে প্রচার কার্য ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা হবে। সকল অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টি কৌশলগত ভাবে অবিভাজ্য থাকবে তাও সিদ্ধান্ত হয়। কোন একজন মুক্তি পাবে আর অন্যদের শাস্তি হবে সেভাবে মামলাটি পরিচালিত হবে না। সকলকে মুক্ত এবং একই সাথে আইউব খানের অসৎ উদ্দেশ্য জনসম্মুখে প্রচার করে তাকে বাঙালিদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এই মর্মে স্থির করা হয়। সেই সাথে বাঙালিদের স্বাধীনতার বিষয়টিকেও জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে স্বাধীনতার ধারণা জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে।[৭]

অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ডিফেন্স টিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সকল অভিযুক্ত ট্রাইব্যুনালে অভিযোগের উত্তরে শুরুতেই নিজেদের 'নিরপরাধ' বা 'নট গিল্টি' দাবী করবে। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বার্থে এবং বাঙালি জাতির মূল লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে বিচার প্রলম্বিত বা দীর্ঘ সময় ব্যাপী হওয়া প্রয়োজন বলে ডিফেন্স টিম যুক্তি স্থাপন করে। ডিফেন্স টিম যুক্তি দিয়ে বলে যে, দোষ স্বীকার করলে তাড়াতাড়ি বিচারকার্য শেষ হবে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে দীর্ঘদিনব্যাপী যে প্রচারণা প্রয়োজন তা অর্জিত হবে না। অপরপক্ষে, নির্দোষ বা নিরপরাধ দাবী করলে বিচারকার্য দীর্ঘকালব্যাপী চালানো যাবে এবং প্রতিদিন ট্রাইব্যুনাল কক্ষ থেকে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে, যা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হবে। একই সাথে অভিযুক্তদের অভিযোগ থেকে মুক্ত করারও সম্ভাবনা থাকবে।[৮]

---

৭. Colonel Shawkat Ali, op. cit., P. 94.

৮. Ibid, P. 95.

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে ১৯-৬-১৯৬৮ তারিখে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের হাজির করা হয়। শেখ মুজিবসহ মোট তের জন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি অফিসার্স মেস-এ বন্দী ছিলেন। বাকী ২২ জনকে ক্যান্টনমেন্টের অন্যত্র রাখা হয়েছিল। ৩৫ জন অভিযুক্তকে একটি প্রিজন ভ্যানে করে ট্রাইব্যুনাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। শেখ মুজিব প্রিজন ভ্যানে উঠেই সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা কোন চিন্তা করোনা, তোমাদের কিছু হবে না।" তিনি আরো বললেন যে, ইংল্যান্ড থেকে একজন বিখ্যাত আইনজীবী আসবেন মামলা পরিচালনার জন্য। কিছুক্ষণ পর শেখ মুজিব সকলকে আহ্বান করেন একটি দেশ প্রেমমূলক গান গাওয়ার জন্য। সকলেই তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে শুরু করলেন ডি.এল রায়ের বিখ্যাত গান 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা.....।' গান গাইতে গাইতে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তরা ট্রাইব্যুনালের সামনে পৌছেন।শেখ মুজিবুর রহমানের সাহচর্যে নিমিষেই অভিযুক্তদের ভয়-ভীতি-দূর হয়ে যায় এবং সকলেই বীরের বেশে ট্রাইব্যুনাল কক্ষে প্রবেশ করেন।[৯]

বিচার কার্যের প্রথম দিন অর্থাৎ ১৯-০৬-১৯৬৮ তারিখে অভিযুক্তদের ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক পৃথক অভিযোগ পাঠ করা হয়। অভিযোগ পত্রটি ছিল ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ দলিল। আইউব খানের সামরিক শাসনামলে পাকিস্তানেব সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঞ্জুর কাদের সরকার পক্ষের প্রধান কৌশুলী ছিলেন। তিনি প্রথম ট্রাইব্যুনালে বক্তব্য পেশ করেন এবং ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী অভিযোগ পত্রটি যখন আদালতে পাঠ করা হচ্ছিল তখনই কেবল ৩৫ জন অভিযুক্ত অনুপুঙ্খ ঘটনা জানতে পারেন। কারণ এর আগে অভিযুক্তরা সকল ঘটনা এবং পরিকল্পনার সাথে কারা কারা জড়িত ছিলেন তা জানতেন না। কারণ কোন অভিযুক্তই পূর্ণ পরিকল্পনা জানার সুযোগ পেতেন না। অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রত্যেকে যার যার করণীয় খণ্ডিত অংশটুকু জানতেন, যাতে করে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে সরকারের কাছে বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সমস্ত খবর ফাঁস হয়ে যেতে না পারে। বিদ্রোহের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। কর্নেল শওকত আলী (অভিযুক্ত নং-২৬) র ইংরেজীতে লেখা Armed Quest for Independence বইটির নবম পরিচ্ছেদের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "অভিযোগনামা শোনার পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে অহেতুক এই মামলায় জড়িত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঘটনাবলী সম্পর্কে হয়তো কিছুই জানতেন না। কিন্তু অভিযোগনামার বিবরণ শুনে আমার মনে হয়েছে যে, তিনি অনেক কিছুই জানতেন এবং সশস্ত্র পরিকল্পনায় তাঁর সম্মতিও ছিল।"

প্রথম দিনের বিচারকার্যের পর আদালত মুলতবি হয়ে যায় এবং মুলতবির পর ২৯-৭-৬৮ তারিখে মামলার শুনানী শুরু হয়। স্যার টমাস উইলিয়াম এম.পি.কিউ.সি সেদিন প্রথমবারের মত আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিন পাকিস্তান থেকে দুইজন আইনজীবী এসেছিলেন অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য। লাহোর থেকে এসেছিলেন এডভোকেট মাহমুদ আলী কাসুরী

৯. Ibid. PP. 93-93.

Dhaka University Institutional Repository

এবং করাচী থেকে ব্যারিষ্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো (আইউব খানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী)। তাঁরা অভিযুক্তদের পক্ষে 'প্রতীকী সমর্থনের' জন্য এসেছিলেন।

৫ আগস্ট ১৯৬৮ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের কৌশুলী মিঃ টমাস উইলিয়াম শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ষড়যন্ত্র মামলার বিচার পরিচালনার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন পেশ করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ 'কেন ষড়যন্ত্র মামলার পরিচালনা অবৈধ ঘোষণা করা হবে না' এবং 'কেন শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে না' মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রতি একটি রুল জারি করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, সংশোধনীটি পাকিস্তানের সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী। ট্রাইব্যুনাল অবশ্য এর বৈধতা সংক্রান্ত কোন আপত্তি শুনবে না বলে রুলিং দিয়েছিল এবং মামলার শুনানী শুরু করতে নির্দেশ দিল। এরপর সরকার পক্ষ একজন একজন করে তাদের সাক্ষীদের হাজির করে। সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় একজন রাজসাক্ষীকে দিয়ে। ১নং সাক্ষী ছিলেন পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেঃ মোজাম্মেল হোসেন। তাঁর সাক্ষ্যতেই তিনি করাচীতে ১৯৬৪ সালের শুরুর দিকে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় অনুষ্ঠিত একটি গোপন বৈঠকের কথা উল্লেখ করেন। সে সভায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনার কথা আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, এই পরিকল্পনা নিয়ে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ এরমধ্যে কোন একদিন করাচীতে ২নং সাক্ষী কামাল উদ্দীনের বাসায় আর একটি সভা হয়। সে সভায় শেখ মুজিবকে সশস্ত্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। শেখ মুজিব জানান যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার সাথে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনার মিল রয়েছে। তিনি তাঁদের (বিপ্লবীদের) সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। মোজাম্মেল হোসেন এরপর ১৫-২১ জানুয়ারি (১৯৬৫) মধ্যে করাচীতে শেখ মুজিবের সাথে অনুষ্ঠিত আরো একটি গোপন বৈঠকের কথা আদালতে বলেন। এই বৈঠকে শেখ মুজিব তাঁর সহযোগিতার আশ্বাস পূর্ণব্যক্ত করেন এবং বিপ্লবীদের কার্যাবলী ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দেন। ২নং সাক্ষী কামালউদ্দীন সকল ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কিন্তু তাঁকে রাজসাক্ষী না করে সরকার পক্ষ নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত করে। সরকার পক্ষের লক্ষ্য ছিল রাজসাক্ষী মোজাম্মেল হোসেনের সাক্ষ্য-সমর্থনের জন্য কামালউদ্দীনকে দিয়ে নিরপেক্ষ সাক্ষীর কাজটি সেরে নেওয়া। কারণ আইন অনুযায়ী শুধু রাজসাক্ষী অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু সরকার পক্ষের শেখানো সাক্ষ্য ট্রাইব্যুনালে না দিয়ে অভিযুক্তদের পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দেন।[১০]

কামালউদ্দীন সরকার পক্ষের শিখানো সাক্ষ্য না দিয়ে অভিযুক্তদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ঘটনাবলীর সাথে গভীর ভাবে জড়িতদের একজন হয়েও তিনি সকল ঘটনা অস্বীকার করেন।

---

১০. Ibid, P. 98.

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাথে সরকার পক্ষ তাঁকে "বৈরী" ঘোষণা করে। ট্রাইব্যুনাল কক্ষে কামালউদ্দীনকে যখন বলা হয় শেখ মুজিবকে সনাক্ত করতে সে তখন অনেক নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হককে (অভিযুক্ত নং ১৭) দেখিয়ে দেন। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে সনাক্ত করতে বললে আহমদ ফজলুর রহমান (৬নং অভিযুক্ত) কে দেখিয়ে দেন। কামালউদ্দীনকে আহমদ ফজলুর রহমানকে সনাক্ত করতে বললে এ.বি.এম সামাদ (অভিযুক্ত নং ৮) কে সনাক্ত করেন। কামালউদ্দীন আদালতকে জানান তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয় এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বানোয়াট স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য করা হয়। কামালউদ্দীনের স্বীকারোক্তি আদালতের বাইরে 'সেনসেশন' সৃষ্টি করে। ডিফেন্স টিমের জন্য এই ব্যাপারটি আইনগত দিকে থেকে একটি বিজয়ের সূচনা করে। রাজনৈতিক ভাবে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আরো ব্যাপক এবং সুফলদায়ক। এরপর থেকে দেশে-বিদেশে মামলার ব্যাপারে আরো ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন (এয়ার ফোর্সের প্রাক্তন কর্পোরাল) ছিলেন আরেকজন রাজসাক্ষী। তিনি ছিলেন মোয়াজ্জেম হোসেনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও কাছের মানুষ। বিদ্রোহ পরিকল্পনার সকল ঘটনা ছিল তাঁর নখদর্পণে। মূলতঃ তিনি ছিলেন সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী। সরকার পক্ষ তাঁর উপরেই অভিযোগ প্রমাণের জন্য দারুণভাবে নির্ভর করছিল। তিনি সরকারের পক্ষ হয়ে তার সাক্ষ্যের মাধ্যমে সরকারের স্বার্থ বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুব চতুর এবং তাকে ডিফেন্স টিম শত জেরা করেও কাবু করতে পারে নি। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে করাচী, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিপ্লবীদের পক্ষে যা কিছু করেছিলেন সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে আদালতকে বলেন। সরকারি অভিযোগ নামায় লিপিবদ্ধ প্রায় সকল অভিযোগ তাঁকে দিয়ে সরকার পক্ষ প্রমাণ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয় মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ব-হস্তে লিখা একটি ডাইরী, যাতে নিম্নোক্ত 'ছদ্ম' বা 'কোড' নামগুলি লিখা ছিল।[১১]

পরশঃ	শেখ মুজিবুর রহমান	১নং অভিযুক্ত
আলোঃ	মোয়াজ্জেম হোসেন	২নং অভিযুক্ত
উল্কাঃ	আমীর হোসেন	৩নং অভিযুক্ত
তুহিনঃ	মোজাম্মেল হোসেন	১নং সাক্ষী
কামালঃ	সুলতান উদ্দীন আহমেদ	৪নং অভিযুক্ত
মুরাদঃ	স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান	৩নং অভিযুক্ত
তুষারঃ	আহমেদ ফজলুর রহমান	৬নং অভিযুক্ত
সবুজঃ	নুর মোহাম্মদ	৫নং অভিযুক্ত
শেখরঃ	রুহুল কুদ্দুস	১০নং অভিযুক্ত

১১. Ibid. P. 99.

Dhaka University Institutional Repository

আমীর হোসেনের সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিবাদীপক্ষের আইনজীবীরা তাকে গুরুত্বের সাথে জেরা করে। অভিযুক্তদের প্রথম আইনজীবী যিনি তাকে জেরা করেন তিনি ছিলেন স্যার টমাস উইলিয়াম এবং দ্বিতীয় আইনজীবী ছিলেন আব্দুস সালাম খান।

এই মামলায় প্রথম দিকে ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা পেশ করা হলেও শেষ পর্যন্ত ২৫১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে ১১ জন ছিল রাজসাক্ষী। ১৯৬৯ সালের ২৩ জানুয়ারি সর্বশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। চারজন সাক্ষীকে অভিযুক্তদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে 'বৈরী' ঘোষণা করা হয়। তারা ছিলেন ঃ

১। কামাল উদ্দীন আহমেদ	২নং সাক্ষী
২। এ.বি.এম ইউসুফ	১০নং সাক্ষী
৩। আবুল হোসেন	২৫নং সাক্ষী
৪। বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত	১৭০নং সাক্ষী

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-অভিযুক্তদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা সমাপ্ত হয়। বিবৃতিদান প্রসঙ্গে অধিকাংশ ব্যক্তি আটক থাকাকালে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেনা সদস্য ও পুলিশ কর্তৃক তাদের উপর দৈহিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন। অভিযুক্ত সকলেই তাদের আইনজীবীদের অদৃশ্য অভিন্নকৌশল অবলম্বণের কারণে (৩৫ জন) বলিষ্ঠভাবে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করেন। অবশ্য অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, জনগণকে সঠিক ঘটনা জানানোর প্রয়োজন রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে অভিযুক্তদের দেশপ্রেমমূলক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানানো উচিৎ। আর সে কারণেই অভিযুক্তদের 'দোষী' বা 'গিল্টি' 'প্লিড' করা উচিৎ। একপর্যায়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁর অনুগত কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তিনি স্বীকার করবেন, "আমরা দোষী-বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেছি। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও করবো।"[১২] ডিফেন্স টিম তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করান। অনেকেই যুক্তি দেখাতে পারেন যে, আদালতে নিজেদের নির্দোষ দাবী করে পরবর্তীতে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সশস্ত্র পরিকল্পনা করার কৃতিত্ব দাবী করা অনৈতিক। কারণ তখন প্রকাশ্যেই মামলাটিকে 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র' মামলা বলে দেশপ্রেমিক বাঙালিরা প্রচার করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, দেশদ্রোহিতামূলক কোন মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্তদের বিবৃতি সর্বাংশে সত্য বলে ধরে নেয়া যায় না। কারণ যে কোন মামলার আসামী পক্ষই তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে থাকে। তদুপরি এ মামলা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি রাজনৈতিক ইস্যু ছিল। রাজনৈতিক ভাবেই এর আনুসাঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

---

১২. মোস্তাক আহমেদ, *লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা*, প্রকাশক মোস্তাক আহমেদ, ৫/এ, নিউ সার্কুলার রোড, সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা ২৪-০৩-১৯৮০ পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

অভিযুক্তরা তখন নিজেদের দোষী বলে স্বীকার করলে হয়তো তাদের ব্যক্তিগত 'বীরত্ব' আরো মহিমান্বিত হতো এবং ইতিহাসে তাঁদের বীরত্বগাঁথা হয়তো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে সমুন্নত থাকতো। কিন্তু মামলাটি ঘিরে দেশপ্রেমিক জনতার আবেগ, চিন্তা ও চেতনার যে স্ফূরণ ঘটেছিল ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল-তা থেকে তাদের হয়তো বঞ্চিত করা হতো। তাছাড়া জনগণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছিল যে স্বাধীনতা সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা বা ব্যাপক প্রস্তুতির বিষয়ে যথেষ্ট সময়ও পাওয়া যেতো না।

অভিযুক্তরা যদিও নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করেছে, তথাপি মূল ঘটনা তখন কারোই অজানা ছিল না। পূর্ববাংলার জনগণ বুঝেছিল দেশপ্রেমিক বাঙালিরা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে আব্দুর রউফের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, "না কোন ভাবেই নতি স্বীকার করা যাবে না। এসব কথা ভাবতে ভাবতে যে কোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম। চিত্ত ভয়শূন্য হয়ে গেল। নিমিষে মনটা ছোট্ট কুঠুরীর দেয়াল ছাড়িয়ে ১২০০ মাইলেব ব্যবধান পেরিয়ে সুদূর পূর্ব পাকিস্তান চলে গেল। আমার কল্পনার চোখে ফুটে উঠল, 'দেশবাসী নিশ্চয়ই একদিন আমার গ্রেপ্তারের কথা জানবে, জানবে এর অন্তর্নিহিত কারণটুকু। সেদিন নিশ্চই তারা আন্দোলন করে এ বন্দীশালা থেকে আমাকে মুক্ত করে নেবে। আমি বিজয়ীর বেশে ফিরে যাব।"[১৩] ভবিষ্যৎ বংশধরদের পরবর্তীকালে ঐ সময়ের ঘটনাবলী এবং মামলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বেশ কিছু বই পুস্তক রচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তন্মধ্যে ২৬নং অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলীর *Armed Quest for Independence* বা *স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র অন্বেষণ* বইটি উল্লেখ যোগ্য। বইটির পাতায় পাতায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকার পক্ষের অভিযোগ (যা বইটিতে পরিশিষ্ট আকারে সংযোজিত হয়েছে), তাও সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা বই থেকেই বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম স্বাধীনতার সার্বিক ইতিহাস সঠিকভাবে জানার সুযোগ পায়।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ঘিরে সরকারের যে উদ্দেশ্য ছিল তাকে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পক্ষে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা অত্যন্ত কৌশলে মামলাটিকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন এবং সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যকে পত্রিকাসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করেন। তাছাড়া অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদিও সরকারের হাতে ছিল না। মওদুদ আহমদের ভাষ্য মতে, "উপমহাদেশের ফৌজদারী আইন এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন লোকের পক্ষে এটা বোঝা কঠিন হবে না যে, উল্লিখিত অভিযোগগুলি দিয়ে কাউকে দোষী সব্যস্ত করা কঠিন। জনরব এবং পরোক্ষ প্রমাণ

১৩.আব্দুর রউফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ভাল প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয় না এবং জনশ্রুতির উপর রেকর্ডকৃত বিবৃতি আইনের দৃষ্টিতে ষড়যন্ত্র হিসেবে অচল বলে ধরে নেয়া হয়।"[১৪]

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি' প্রলম্বিত করার ব্যাপারে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অভিমত তুলে ধরা হলো।

আব্দুর রাজ্জাক এম.পি. বলেন, "মামলা চলাকালীন সময়ে বাঙালিরা ভাবতে শুরু করে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। মামলার ফলাফল নিয়ে চিন্তাতো ছিলই কিন্তু মূল চিন্তা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে মামলাটিকে সেভাবেই পরিচালিত করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের আইনজীবীগণ মামলাটিকে নিছক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পরিচালনা করেননি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল এই মামলার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবে বাঙালিদের অধিকারের প্রশ্ন এবং প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয় সাক্ষীদের জেরার মাধ্যমে তুলে ধরা এবং এসব বিষয় সংবাদ পত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। সে কারণেই মামলার বিচারকার্য প্রলম্বিত করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।" আব্দুর রাজ্জাক (এম.পি.) সাক্ষাৎকার, ১১-০৯-২০০৩ ইং।

২৬নং অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলী বলেন, "মামলা যতই এগুতে থাকে গণআন্দোলন ততই তীব্র হতে থাকে। ধীরে ধীরে আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইউব খান এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং অভিযুক্তদের মুক্তি দেন। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে।" কর্নেল শওকত আলী/সাক্ষাৎকার, ১৫-৯-২০০৩ ইং।

৩০নং অভিযুক্ত মোঃ মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী বলেন, "আগরতলা নাম লাগানো হয় যাতে সাধারণ মানুষ আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়। প্রথম দিকে পাকিস্তানের এ উদ্দেশ্য কিছুটা সফলতা পেলেও এবং আমাদের আত্মীয় পরিজনরাও মামলার প্রথম দিকে আমাদের সাথে সম্পর্ক ক্রমশঃ প্রায় ছিন্ন করার পর্যায় চলে গেলেও, মামলা যতই অগ্রসর হয় এবং আমাদের আইনজীবীরা যখন ক্রমশঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার ও অন্যায় আচরণ প্রকাশ করতে থাকেন এবং এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান তুলে ধরতে থাকেন, তখন সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং আইউব খান মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।" মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী/সাক্ষাৎকার, ৪-০৬-০৩ ইং।

মওদুদ আহমদ এর কথায় "মাসের পর মাস প্রতিদিন সংবাদ পত্রে এই ষড়যন্ত্র মামলার ধারা বিবরণী প্রকাশিত হয়। মামলার আরজি এবং সাক্ষীদের সওয়াল জবাব পাঠকেরা প্রতিদিন আগ্রহ সহকারে পাঠ করতে থাকেন। জনসাধারণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে থাকেন যে, কতিপয় লোক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থে কিছু তৎপরতা চালাতে গিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। তারা জানতে পারেন কিভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে পূর্বে-পাকিস্তানকে

১৪. মুওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন একটি সশস্ত্র বিপ্লব এবং অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহে কি পরিমাণ ঝুঁকি তাঁরা নিয়েছিলেন। এটা ছিল জাতীয় পর্যায়ে বাঙালিদের জন্য একটি রি-ওরিয়েন্টেশন কোর্সের মত। প্রতিদিন তারা তাদের ওপর আরোপিত অবিচার ও শোষণের ঘটনা এবং তার নিরসনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার বিস্তৃত-বিবরণ জানতে উন্মুখ হয়ে থাকতেন।"[১৫]

১০ ফেব্রুয়ারি বাদীপক্ষের প্রধান কৌশুলী মঞ্জুর কাদের ট্রাইব্যুনাল সমীপে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন শুরু করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সওয়ালজবাব চলার পর ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়। মঞ্জুর কাদেরের অসুস্থতার জন্য কোর্টের অধিবেশন আরও একদিনের জন্য মুলতবী হয়। নির্ধারিত তারিখে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বসার আগের দিনই এক ঘোষণার মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন ১০ মার্চ পর্যন্ত মুলতবী করা হয়।

ইতোপূর্বে ১৫ ফেব্রুয়ারি সেনানিবাসে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তানি সশস্ত্র পাহারাদারের গুলির আঘাতে মামলার ১৭নং আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক মারা যান এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক মারাত্মকভাবে আহত হন।

সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইস এডমিরাল এ.এর. খান প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিম্নোক্ত ঘোষণা দেন, "জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করার পরে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই কোন প্রকার বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য সরকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বাতিল করিয়াছেন এবং উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।[১৬]

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি প্রেসনোটে ২৮ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলেও তাহাদের মধ্য থেকে চারজনকে ক্ষমা প্রদর্শন করে রাজসাক্ষী করা হয়। পরে আরো কয়েকজনকে অন্তর্ভূক্ত করে মোট ৩৫ জনকে আসামী করা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন ঃ

১। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান
২। জনাব লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (নৌবাহিনী)
৩। জনাব স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান (নৌবাহিনী)
৪। প্রাক্তন এল.এস সুলতান উদ্দীন (নৌবাহিনী)

---

১৫. মওদুদ আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

১৬. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃ. ৪৩৪,। Pakistan Observer. ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ইং।
আরো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা-বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে সরকার পক্ষের আরজি ও আসামীদের জবানবন্দী, প্রকাশক, মহিউদ্দিন আহমদ, ১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ১৯৭০, পৃ. ৯৪-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫। লীডিং সীম্যান নুর মোহাম্মদ	(নৌবাহিনী)
৬। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান	(সি.এস.পি)
৭। ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ	(বিমান বাহিনী)
৮। প্রাক্তন কর্পোরাল এ.বি.এম সামাদ	(বিমান বাহিনী)
৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দীন	(সেনা বাহিনী)
১০। জনাব রুহুল কুদ্দুস	(সি.এস.পি)
১১। জনাব ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক	(বিমান বাহিনী)
১২। জনাব বিভূতিভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী	(ব্যবসায়ী আওয়ামী লীগ নেতা)
১৩। বিধানকৃষ্ণ সেন	(রাজনৈতিক নেতা)
১৪। সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক	(সেনাবাহিনী)
১৫। প্রাক্তন হাবিলদার মুজিবুর রহমান	(সেনাবহিনী)
১৬। প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুর রাজ্জাক	(বিমান বাহিনী)
১৭। সার্জেন্ট জহুরুল হক	(বিমান বাহিনী)
১৮। প্রাক্তন মোঃ এ.বি. খুরশীদ	(নৌবাহিনী)
১৯। জনাব খান মোহাম্মদ সামসুর রহমান	(সি.এস.পি)
২০। রিশালদার এ.কে.এম. সামসুর রহমান	(সেনাবাহিনী)
২১। হাবিলদার আজিজুর রহমান	(সেনাবাহিনী)
২২। এস.এম. মাহফিজুল বারী	(বিমান বাহিনী)
২৩। সার্জেন্ট সামসুল হক	(বিমান বাহিনী)
২৪। মেজর ড. সামসুল আলম	(সেনাবাহিনী)
২৫। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আব্দুর মুত্তালিব	(সেনাবাহিনী)
২৬। ক্যাপ্টেন শওকত আলী	(সেনাবাহিনী)
২৭। ক্যাপ্টেন এ.এন.এস নুরুজ্জামান	(সেনাবাহিনী)
২৮। ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা	(সেনাবাহিনী)
২৯। সার্জেন্ট আব্দুল জলিল	(বিমান বাহিনী)
৩০। জনাব মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী	(ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা)
৩১। লেঃ এস.এম. রহমান	(নৌবাহিনী)
৩২। প্রাক্তন সুবেদার এ.কে.এম তাজুল ইসলাম	(সেনাবাহিনী)
৩৩। মোঃ আলী রেজা	(ইন্সট্রাকটর নিপা)
৩৪। ক্যাপ্টেন (ডঃ) খুরশীদ উদ্দীন আহমেদ	(সেনাবাহিনী)
৩৫। লেঃ আব্দুর রউফ	(নৌবাহিনী)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র: *মামলার মূল অভিযোগনামা*, পরিশিষ্ট-২। আরো, Colonel Shawkat Ali, *Armed Quest for Independence*, pp. 113-130.

এই মামলায় মোট ১১ ব্যক্তি ক্ষমা প্রাপ্ত হন। তারা হলেন ঃ

১। লেঃ মোজাম্মেল হোসেন	(ময়মনসিংহ)
২। এক্স কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া	(মাদারীপুর)
৩। সার্জেন্ট সামসুদ্দিন আহমেদ	(ময়মনসিংহ)
৪। ড. সাইদুর রহমান	(চট্টগ্রাম)
৫। মির্জা মোহাম্মদ রমিজ	(চট্টগ্রাম)
৬। ক্যাপ্টেন আলীম ভুঁইয়া	(কুমিল্লা)
৭। কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম	(কুমিল্লা)
৮। কর্পোরাল জামাল উদ্দীন	(পাবনা)
৯। মোঃ গোলাম আহমদ	(মাদারীপুর)
১০। মোঃ ইউসুফ	(বরিশাল)
১১। সার্জেন্ট আব্দুল হালিম	(কুমিল্লা)

তথ্যসূত্র : *মামলার মূল অভিযোগনামা*, পরিশিষ্ট-২।

মামলায় সরকার পক্ষের যে চারজন সাক্ষীকে বৈরী করা হয়েছিল ঃ

১। জনাব কামাল উদ্দীন	(২নং সাক্ষী)
২। জনাব এ.বি.এম ইউসুফ	(১০নং সাক্ষী)
৩। জনাব আবুল হোসেন	(২৫নং সাক্ষী)
৪। জনাব বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত	(১৭০নং সাক্ষী)

* তথ্যসূত্র : *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা* বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে সরকার পক্ষের আরজি ও আসামীদের জবানবন্দী, প্রকাশক মহিউদ্দীন আহমেদ, ১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড, ১৯৭০। আরো, *মূল অভিযোগনামা*, পরিশিষ্ট-২, আরো, Colonel Shawkat Ali. *Armed Quest for Independence*, Appendix--D, PP-113-132।

সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র* পৃ. ২৫-২৬, বাংলা একাডেমী, ২০০০ ; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ২য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৫

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আইউব সরকারের উদ্দেশ্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসকপক্ষ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। স্বার্থান্ধ নীতি, কূটকৌশল, গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি অনীহা, দায়িত্বহীনতা তৎকালীন রাজনীতিবিদদের প্রতি জনগণকে বিতৃষ্ণ করে তোলে। "মুক্তি চাচ্ছিল তারা রাজনীতিবিদদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অরাজকতা থেকে।"[১]

রাজনৈতিক দলগুলির অপতৎপরতা এবং পারস্পরিক কোন্দল জনগণকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। একই সাথে চোরাচালান ও দুর্নীতির কারণে জনগণ তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ--এমনই এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলে উৎসাহিত করে। খুব ভেবে চিন্তে ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর পাকিস্তানের ক্ষমতার মসনদে আসীন হন আইউব খান। একই সাথে তিনি দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ক্ষমতা দখল কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। "আইউব খান অনেক দিন ধরেই ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।"[২]

দীর্ঘ পরিকল্পনার ফলশ্রুতি ছিল আইউব খানের ক্ষমতা দখল। ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করতেন এবং যে কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। এ ভাবেই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নিজস্ব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। "আত্মজীবনীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক অন্তত ১৯৫৪ সাল থেকে আইউব পাকিস্তানের জন্য তাঁর পরিকল্পনা নির্মাণ করে আসছিলেন।"[৩]

পূর্ববর্তী সরকার গুলির ব্যর্থতার কারণে পাকিস্তানের জনগণ আইউব খানের ক্ষমতা দখলকে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিল। "একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, প্রথম সামরিক আইন জারীর সংবাদ মানুষ শুধু মেনেই নিল না, তারা অতিরিক্ত আশাবাদীও হয়ে উঠল।"[৪]

---

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস,* স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ১০১।

২. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২। আরো, ড. হারুন অর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২।

৩. প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

আইউব খানের প্রতি জনগণের মোহভঙ্গ হতে বেশী সময় লাগলো না। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের প্রতি আইউব খান প্রথম থেকেই বিরূপ ছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীনতা, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, সর্বত্র-সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে সেনাপ্রধান, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুরু হলো সামরিক একনায়কত্ব। "এভাবে সমরতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র একাকার হয়ে এক মহাশক্তিধর, সর্বত্রব্যাপী ও সুদক্ষ অধিযন্ত্রে পরিণত হলো।"[৫] পূর্ববর্তী শাসকদের ব্যর্থতা আইউব খান কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দণ্ডমুন্ডের কর্তা হিসেবে নিজেকে আসীন করতে যেয়ে তিনি শ্রেণীশত্রু নির্মূলে তৎপর হলেন। রাজনীতিবিদদের শত্রু মেনে শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানীসহ প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করতে শুরু করলেন। সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিকে তিনি কঠিন হাতে নিয়ন্ত্রণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নির্বাচিত ছাত্র সংসদ, ছাত্র-রাজনীতি সব কিছুই নিষিদ্ধ হলো।। "এভাবে পাকিস্তানে এমন এক নিরঙ্কুশ এককেন্দ্রিক শাসন কায়েম হলো যা উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক শাসনকেও লজ্জা দিলো।"[৬] রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের প্রতি বিরক্ত থাকলেও আইউব খান নিজের অবস্থানকে বৈধ করার জন্য নির্বাচনকে সম্পূর্ণ বাতিল করার চেষ্টা করেন নাই। বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর PRODO (Public Representative Office Disqualification Order) এবং EBDO (Elective Bodies Disqualification Order) নামে দুটি অধ্যাদেশ জারি করে তিনি পাকিস্তানের অনেক পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাও যার ফলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারালেন। "এর ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে পূর্ব বাংলার ক্ষমতা বর্হিভূত রাজনৈতিক এলিটরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেশের শাসন ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ খোলা থাকলো না। আইউব শাসন আমলেই বাঙালিদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতি-সত্তার স্ফূরণ অধিক মাত্রায় ঘটে। পাকিস্তানের ভাঙ্গন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় যার চূড়ান্ত পরিণতি।"[৭]

আইউবের স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে বাঙালিদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সব সুযোগই বন্ধ হয়ে যায় যা আইউব নিজে তাঁর এক দশকের শাসন ক্ষমতার অবসানের সময় স্বীকার করছেন।[৮]

জেনারেল আইউব ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করে ১৯৬২ সালের জুন পর্যন্ত সামরিক শাসনাধীনে দেশে স্টীমরোলার চালান। এ সময় কালে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা বা

---

৫. প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ মোনায়েম সরকার ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।
৭. ড. হারুন অর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪।
৮. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

জনমত গড়ে তোলা ছিল বিরাট কঠিন ব্যাপার। এর মধ্যেই আইউব খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে চেষ্টা করে। "পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ সেই চ্যালেঞ্জটিই সেদিন গ্রহণ করেছিল এবং সফলও হয়েছিল। দীর্ঘ চার বছর পর বাষট্টিতে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আইউবের স্বৈরশাসনে প্রথম কাঁপন ধরাতে ছাত্ররা অবশেষে সক্ষম হয়।"[৯] একই সাথে আইউব এর সামরিক শাসনের স্টীমরোলার উপেক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক প্রতিবাদ হতে দেখে আইউব ৮ জুন ১৯৬২ তারিখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। এতে তিনি তাঁর ক্ষমতার মুল ভিত্তি তথা সেনাবাহিনীর সরাসরি সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন। অপরদিকে মৌলিক গণতন্ত্রীরাও বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম না হওয়ায় অসহায় আইউব স্বয়ং নিজে তাঁর সমর্থনে একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। ৩০ জুন ১৯৬২ সংসদে Political Bill 1962 (রাজনৈতিক দল বিল) উত্থাপন করা হয় যা ১৪ জুলাই ১৯৬২ পাস হয়। এর মাধ্যমে সংবিধিগত ভাবে রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা পুনরায় শুরুর ব্যবস্থা করা হয়। তবে এতে তিনি কিছু শর্ত জুড়ে দেন। শর্তগুলো ছিল :

১। দলকে ইসলামী মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে।

২। পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতি নষ্ট হয় এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

৩। কোন দল বৈদেশিক সাহায্য নিতে পারবে না এবং

৪। পূর্বের ঘোষিত EBDO ও PRODO দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত কোন রাজনীতিবিদ দল গঠন করতে বা দলের সদস্য হতে পারবে না।[১০]

আইউব খান কর্তৃক দেশকে সংবিধান (নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত) প্রদান, সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালিরা আইউবের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে নাই।

১৯৬৪ সালে আইউব রাজনৈতিকভাবে অনেক জটিলতায় জড়িয়ে পড়েন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর অবস্থানকে আরো বিপর্যস্ত করে তোলে। এহেন এক পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। যুদ্ধের দায়ভার এসে পড়ে আইউবের উপর। জনগণের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর মধ্যেও তাঁর অবস্থা পূর্বাপেক্ষা দূর্বল হয়ে পড়ে। "দুই সপ্তাহ যুদ্ধ চালাবার পরে পাকিস্তানের অস্ত্রের ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়। আইউব খান উপায়ন্তর না দেখে ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) জাতিসংঘের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি মেনে নেন"।[১১] পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্নরূপ। মোট ১৭ দিনের ভারত-পকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ

---

৯. ডঃ.মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০। আরো,সংকলন ও সম্পাদন : নূরুল ইসলাম, *একাত্তরের ঘাতক-দালাল যা বলেছে যা করেছে*, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, ১৯৯১ ঢাকা, পৃ. ১৭।

১০. প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

১১. সংকলন ও সম্পাদন : নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

অরক্ষিত। "যুদ্ধের ১৭ দিন পূর্ব পাকিস্তান শুধু দেশের পশ্চিম অংশ থেকেই বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং সমগ্র বিশ্ব থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বাঙালিরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।.....এ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দেয়া তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণিত হয়।"[১২] "নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এটি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোয় তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র ইতিহাস-ঐতিহ্য, নিরাপত্তা, অন্য কথায়, জাতি--প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়। বস্তুত ; আইউব শাসন ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের কাল।"[১৩]

এরূপ এক পটভূমিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্থাপন করেন বাঙালির 'বাঁচার দাবী' ছয় দফা। শাসক মহল ও রাজনৈতিক মহলে ৬ দফা কর্মসূচী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেননা যে পটভূমিতে শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন তা শাসক পক্ষকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। "দিনের পর দিন অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের চালচ্চিত্র থেকে ৬ দফা সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বুঝে ফেলেছিল তাঁরা এবার ধরা পড়ে যাচ্ছেন।"[১৪]

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুক্ত করাই ছিল ৬ দফার প্রধান লক্ষ্য। যার কারণে বাঙালি ৬ দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, পেশা নির্বিশেষে সকলকে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করাই ছিল এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আইউব সরকার ছয় দফার বিপক্ষে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। "জেনারেল আইউব ছয় দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী', 'ধ্বংসাত্মক', 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠা'র কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করেন এবং এ কর্মসূচীর প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের 'এক নম্বর দুশমন' হিসেবে চিহ্নিত করে ৬ দফা পন্থীদের দমনে 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকি দেন।"[১৫]

ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি আইউব সরকারের আক্রোশ জনগণকে ছয় দফার প্রতি সমর্থন ও সরকারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনে তীব্রতর করে। এ ঘৃণা থেকে যে আন্দোলন শুরু হয় তা প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শাসনকে বুঝিয়ে দেয় যে শক্তি নয়, জনগণের সমর্থনই হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। সারা বাংলায় ৬ দফা কর্মসূচী ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠার প্রেক্ষিতে বাংলার মুক্তি সংগ্রাম নতুন মাত্রা পায়। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অবিসংবাদিত জননেতা হয়ে উঠেন। এ প্রসঙ্গে Professor Rounak Jahan বলেন, "Six Point movement, whose main thrust was the

---

১২. ড. হারুন অর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।
১৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০.
১৫. ড. হারুন অর রশিদ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

demand of autonomy for East Pakistan, is regarded as the turning point in Mujib's rise to charismatic leadership."[১৬]

ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব আরো বেশি লক্ষ্য করা যায় যখন সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে ছয় দফা কর্মসূচিকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে। "পরবর্তীকালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছয় দফার জনপ্রিয়তাকে আরো সুদূরপ্রসারী করে।[১৭]

১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে আইউবের বশংবদ ও গভর্ণর মোনায়েম খান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতায় সচেষ্ট হন, কি করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনবাদীদের চিরতরে নির্মূল করা যায়। যারা ভারতের সাহায্য-সহযোগিতায় পাকিস্তানকে ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গোয়েন্দা লাগানো হয় তথ্য উদঘাটনে। অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানকে ভাঙ্গন ধরানোর কাজে লিপ্ত এমন অভিযোগ এনে কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের আয়োজন করা হয়।[১৮] "জানুয়ারির গোড়ার দিকে সংবাদপত্রে দেয়া প্রথম সরকারী তথ্য বিবরণীতে অভিযুক্তদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিলো না। জানুয়ারির ২০ তারিখে প্রচারিত সরকারী সংবাদ ভাষ্যেই প্রথম বারের মত শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করা হয়, প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে।[১৯] শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পৃক্ততার প্রমাণ প্রথম দিকে না পেয়ে সরকার পক্ষ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামী করে মামলা দায়ের করেন। সরকার নিশ্চিত ছিলেন যে, এ মামলা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের চির অবসান ঘটাবে। ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তানকে বিভক্ত করার রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবেন শেখ মুজিব। এর ফলে একদিকে তার রাজনৈতিক কর্মসূচি ৬ দফা অপর দিকে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব সব কিছুই শেষ করা সম্ভব হবে। ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৮ কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, "আগরতলা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানেরও সম্পর্ক ছিলো। প্রেসনোটে আরও প্রকাশ, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত যে ২৮ জনকে ইতিপূর্বে ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদেরকে Army, Navy and Air Force Acts নামক অন্য আইন অনুযায়ী ১৮ই জানুয়ারি তারিখে (অর্থাৎ গতকাল) গ্রেফতার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে শেখ মুজিবও আছেন। তিনি আগে থেকেই ডি.পি. আর অনুযায়ী ঢাকা জেলে বন্দী ছিলেন। উক্ত আইন অনুযায়ী তারা গ্রেফতার হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান সরকার ডি.পি.আর অনুযায়ী তাঁদের আটকাদেশ প্রত্যাহার করেছেন।"[২০]

---

১৬. Rounaq Jahan. *Bangladesh Politics : Problems and Issues.* UPL. Dhaka. 1980. P. 29.

১৭. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

১৮. মুওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

১৯. ড. কামাল হোসেন, *স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা*,১৯৬৬-১৯৭১, অংকুর প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ১৫।

২০. আব্দুল হক, *লেখকের রোজ নামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩, নূরুল হুদা সম্পাদিত*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, পৃ. ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট আইউব মামলার বিচারের জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারি করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯ জুন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে মামলার বিচার শুরু হয়। মামলাটিকে এ পর্যায় পর্যন্ত আনতে সরকার প্রচুর সময় নেয়। তারপরও রাষ্ট্রদ্রোহী এ মামলার ক্ষেত্রে সরকারের আচরণ ও ছলচাতুরী জনসমক্ষে সরকারের অসাধু উদ্দেশ্যকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।

প্রচলিত আইনের বদলে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, সাধারণ আদালতের বদলে সেনানিবাস এবং অভিযুক্তদের প্রতি সরকারের পেটোয়া বাহিনীর নির্যাতন সর্বোপরি এগার দিন পর মামলায় শেখ মুজিবের ১নং আসামী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি মামলাটির ব্যাপারে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। একইসাথে আইউব সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য জনগণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ মামলাটি যে, আইউব সরকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল তা আব্দুল গাফফার চৌধুরীর নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

"আমার নিজের অভিজ্ঞতা এ সম্পর্কে কম নয়। একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি ; ষাটের দশকের মধ্যভাগে আমি ঢাকায় 'আওয়াজ' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিকের সম্পাদক ছিলাম। শেখ মুজিব সহ বেশ কয়েকজন সমরিক ও অসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ সময় অভিযোগ করা হয়। তারা ভারতের যোগসাজশে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শেখ সাহেব আগেই অন্য মামলায় জেলে ছিলেন। তাঁকে এবং নতুন অভিযুক্তদের (গ্রেফতারের পর) কুর্মিটোলায় স্থানান্তরিত করা হয়। এ সময় একদিন 'আওয়াজ' অফিসে বসে আছি। হঠাৎ টেলিফোন এলো তৎকালীন প্রাদেশিক প্রচারকর্তার। তিনি বললেন, একটি অনুরোধ আছে। শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাকে নাম দিতে হবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' ; তাছাড়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই মামলায় অভিযুক্তদের কঠোর ভাবে নিন্দা করে সম্পাদকীয় লিখতে হবে।

আমি এই টেলিফোনটি পেয়েই বুঝতে পেরেছিলাম, এটা অনুরোধ নয়--হুকুম। তবু বলেছিলাম আগরতলা কথাটি কেন ষড়যন্ত্রের আগে বসবে ? এই সরকারি নির্দেশ কেন ? তাছাড়া অভিযুক্তরা বিচারে দোষী প্রমাণ হওয়ার আগেই তাদের নিন্দা, সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লিখি কিভাবে ? তিনি বললেন, এটা আমাদের অনুরোধ। এই অনুরোধ যদি আমি মান্য করতে না পারি ? তিনি একটু কঠিন স্বরে বললেন, সরকারী অনুরোধ না শুনলে পরিণামে কি হতে পারে-তা আপনার না জানার কথা নয়। এই প্রচ্ছন্ন হুমকী দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। শেখ মুজিব ও অন্যান্য অভিযুক্তদের কার্যকলাপকে নিন্দা জানিয়ে কি লিখতে হবে তার একটা ছোট খাট ব্রিফিং ও দিলেন। ঠিক করেছিলাম কপালে যাই থাকুক এই আদিষ্ট সম্পাদকীয় আমি লিখব না। আমি লিখিনি কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে জেগে দেখেছি, বেশকটি দৈনিক পত্রিকা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' এই হেডিং দিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন। এমনকি এই অভিযোগ সম্পর্কিত খবরের শিরোনামও দিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

'আগরতলা ষড়যন্ত্র'। তাতে শেখ মুজিব ও তাঁর সহযোগীদের এই বলে নিন্দা করা হয়েছে (বিচারে প্রমাণিত হওয়ার আগেই) যে তাঁরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতের যোগসাজশে গুরুতর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ভারতের আগরতলায় গিয়ে এই ষড়যন্ত্র পাকানো হয়েছিল। আমাদের দক্ষ গোয়েন্দা বিভাগ তা আগেভাগেই ধরে ফেলায় দেশ এক গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। সবগুলো সম্পাদকীয় এর একই হেডিং এবং একই সুর দেখে বুঝতে কোন কষ্ট হয়নি যে, এটা আদিষ্ট লেখা। কোন স্বতঃপ্রণোদিত লেখা নয়।"[২১]

কর্নেল শওকত আলীর ভাষ্যতেও দেখা যায় মামলাটির পেছনে আইউব সরকারের কতটা অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করেছে। তাঁর কথায়,

"মামলার সরকারী নামকরণ করা হয়েছিল মামলা শুরু হওয়ার সময়ে, অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন। যেদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্য শুরু হয়, সেদিন আমরা জানতে পারলাম যে, মামলার সরকারী নামকরণ করা হয়েছে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য।' কিন্তু এর আগে থেকেই এই মামলার নাম 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রে প্রচারিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী 'আগরতলা' নামটি মামলার সাথে যুক্ত করলে পাকিস্তানি জনগণকে সহজেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা যাবে। আমাদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে যে অভিযোগনামা হাজির করা হয় তাতে আগরতলা সম্পর্কে ছোট্ট কয়েক লাইনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিলে যে, আমাদের দুইজন বিপ্লবী ভারতীয় সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে অস্ত্রের ব্যাপারে আলোচনা করতে আগরতলা গিয়েছিল। কিন্তু সে আলোচনার ফলে কোন অস্ত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছিল বলে সরকার কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে নাই। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, বিপ্লবীরা আগরতলা গিয়েছিল কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে কোন অস্ত্র আমাদের হাতে আসেনি। তাছাড়া আগরতলা যাওয়ার ঘটনা সমস্ত অভিযোগনামায় খুবই গুরুত্বহীন ছিল। কারণ, সরকার অভিযোগনামায় উল্লেখ করেছে ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। কয়েকবার তারা এই অভিযোগ তাদের অভিযোগনামায় উল্লেখ করেছে। তাছাড়া বিপ্লবীদের বিভিন্ন বৈঠক যা অভিযোগনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয় করাচি, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে। অভিযোগনামায় ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগের ঘটনা ঢাকায় হয়েছে বলে বার বার উল্লেখ করেছে। কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে মামলায় নামের পূর্বে

---

২১. আব্দুল গাফফার চৌধুরী, চতুরঙ্গ, হাসিনা-ত্রিপাটি গোপন বৈঠক, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ নভেম্বর, বুধবার, ২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

'আগরতলা' শব্দটি ব্যবহার করাহিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যদিও বিদ্রোহের পুরো পরিকল্পনাটাই ছিল সঠিক এবং সত্য।"[২২]

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে আইউব খান চারটি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন :

১। পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নির্মূল করা।

২। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে এই মনোভাব জাগিয়ে দেওয়া যে, বাঙালিরা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নয়।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিভেদ ও ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেওয়া।

৪। শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে নির্মূল করা।"[২৩]

বামপন্থী লেখক তারেক আলীর মতে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ :

'১। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভরাডুবি ঘটানো ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।

২। বাঙালিদের সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়ন করে সামরিক বাহিনীতে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বাজায় রাখা।

৩। দুই অংশের জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতা ও বিভেদ রচনা করা ছিল অপর একটি উদ্দেশ্য।'[২৪]

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আইউব সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অন্য যে কোন কিছুর চাইতে এই মামলা পাকিস্তানের সংহতির ব্যাপারে অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়েছিল। উদঘাটিত ষড়যন্ত্রের আলোকে মামলাটি সাজানো হয়েছিল।'[২৫]

প্রকৃত পক্ষেই এই মামলার ফলে আইউব সরকার পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ভেসে যায়। মামলা থেকে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিব একটি জনপ্রিয় নামে পরিণত হন। একই সঙ্গে পর্দার অন্তরাল থেকে সামরিক বাহিনীর একটি অংশের চাপে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইউব প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

'মামলার অভিযোগনামায় অনেক অসংলগ্নতা থাকায় এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, অনেক অভিযোগই ছিল বানোয়াট এবং পরস্পর বিরোধী। যদিও সরকার পক্ষ মামলা তৈরি করতে দীর্ঘ সময় নেয়, তারপরও অভিযোগনামায় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে বাংলার জনগণের কাছে। তথ্যাদির বিবেচনায় অভিযোগনামা খুব একটা জোরদার ছিল না। মিথ্যা,

---

২২. কর্নেল শওকত আলী, সাক্ষাতকার তাং ১৫.৯.২০০২।

২৩. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ১৫।

২৪. আবুল মাল আবদুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১।

২৫. রাও ফরমান আলী খান, *বাংলাদেশের জন্ম ,ভূমিকা : মুনতাসির মামুন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ছিল মামলাটিতে খুব বেশি। অভিযোগকারীরা মামলার গভীরতা অনুধাবন করতে না পেরে মিথ্যা তথ্য সংযুক্ত করে মামলাটিকে প্রহসনে পরিণত করে। আর মামলার প্রচারণায় সরকার এত বেশী অর্থ ব্যয় করে যে, পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে তা অতিরঞ্জন হিসেবেই প্রতিভাত হয়।'[২৬]

সবশেষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে আইউবের চিন্তাধারার বহি:প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে :

"ছাত্রদের আন্দোলনের মধ্যে তিনি বাতিল হয়ে যাওয়া পুরোনো বহুদলীয় রাজনীতির পুনরাবৃত্তি দেখতে পেলেন। পাকিস্তানের বাইরের শত্রুদের পরিকল্পনা ও পরিচালনা মোতাবেক এসব আন্দোলন চলছিল-এরকম বিশ্বাসের মূঢ়তা আইউবকে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে দেয়নি। ২২ শে মার্চ লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আইন শৃঙ্খলার অবনতির জন্য ক লকাতা ও আগরতলার কম্যুনিষ্টদেরকে দায়ী করেন। ২৮শে মার্চ পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে তিনি অভিযোগ করেন যে, কাবুল ও কলকাতা থেকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঐক্যবিনাশী কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে এবং অবাঞ্ছিত মহলের প্রভাবে পড়ে ছাত্ররা অস্থিরতা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়েছে। আইউব বিশ্বাস করতেন যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে উৎসুক ভারতীয় চরেরাই পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত করছে। ২রা এপ্রিল ঢাকায় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে উক্তি করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে সম্মানিত সহযোগী হিসেবে বাস না করলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুদের গোলামে পরিণত হবে। হিন্দুইজমের সাথে কম্যুউনিজমকে গুলিয়ে ফেলে একই নিঃশ্বাসে আইউব পুনরুক্তি করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকৃত হুমকি আসছে কলকাতা ও আগরতলার কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকে। ব্যাখ্যাস্বরূপ যোগ করেন, কলকাতা পূর্ব পাকিস্তানকে তার পশ্চাদভূমি হিসেবে ফিরে পেতে চায়। এসব উক্তিতে পূর্ব পাকিস্তানেও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে আইউব খানের যে প্রকাণ্ড অজ্ঞতা ও বদ্ধমূল কুবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যেই ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী মদদে অনুষ্ঠিত হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার এবং ১৯৬৮ সালে সরকার পরিকল্পিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বীজ নিহিত ছিল।"[২৭]

---

২৬. মওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩, ৯০।

২৭. প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৬

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মামলার ১নং অভিযুক্ত ছিলেন। যদিও ইতিহাস প্রণেতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন লেখকের লেখনী এ ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করে আসছে। এতে করে আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সশস্ত্র বিদ্রোহের গৌরব জনক কাহিনী ক্রমান্বয়ে বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় তৎকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকার চীফ রির্পোটার ফয়েজ আহমদ ও মামলার ২৬নং অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলী এম,পির কথা যাদের লেখনীতে এ বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে মামলার সাথে শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততা এবং সশস্ত্র পন্থার প্রতি শেখ মুজিবের সমর্থন, একই সাথে মামলায় জড়িত হওয়া ও সশস্ত্র পন্থার সাথে মুজিবের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে নেতিবাচক বক্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি সরকারিভাবে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' নামে অভিহিত। সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগনামায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নিম্নরূপ :

১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেখ মুজিব করাচি সফরকালে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ২নং অভিযুক্ত আহুত একটি বৈঠকে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ পান। এর আগে মোয়াজ্জেম হোসেন পূর্ব পাকিস্তান দখল করার উদ্দেশ্যে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এ সম্পর্কে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। দাবি করেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই নৌ-বাহিনীর কতিপয় সদস্যকে নিয়ে একটি জঙ্গিবাহিনী গঠন করা হয়েছে, কথিত বৈঠকে মেয়াজ্জেম হোসেন রাজনৈতিক নেতা ও বেসামরিক অফিসারদের নিকট থেকে সমর্থন এবং সহযোগিতা কামনা করেন। শেখ মুজিব শুধু তাতে সম্মতিই দেননি, উপরন্তু তিনি বলেন যে, তিনিও একই চিন্তা ভাবনা করছেন। তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। যখন আহমেদ ফজলুর রহমান ৬নং অভিযুক্ত এতে ভারতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চান তখন মুজিব বলেন যে, এ বিষয়টা তিনি দেখবেন। শেখ মুজিব তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করলে এ ধরনের তৎপরতার প্রয়োজন নাও হতে পারে। সেখানে উপস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন ২নং অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম, ৩নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব, ৪নং অভিযুক্ত সুলতান, ৬নং অভিযুক্ত আহমেদ ফজলুর রহমান এবং ১নং সাক্ষী মোজাম্মেল হোসেন।[১]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব করাচি অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় ২নং অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে শেখ মুজিব বলেন যে, 'একমাত্র যে পথে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন সেটি হলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা' তিনি এই বিপ্লবী পরিকল্পনার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন এবং আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার করেন। তিনি বিপ্লবীদের সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করে বিপ্লবী গ্রুপের তৎপরতা জোরদার করার পরামর্শ দেন।[২]

২নং অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেন ৩নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং অভিযুক্ত সুলতানের মাধ্যমে শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করে ২৯ আগস্ট শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় এক বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকে মোয়াজ্জেম দাবি করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে সম্মত রয়েছেন সশস্ত্র বাহিনীর এমন বহু সংখ্যক সদস্যদের নাম তিনি তালিকাভুক্ত করেছেন। মোয়াজ্জেম তহবিল, অস্ত্র শস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শেখ মুজিব ভারত থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। শেখ মুজিব সাময়িক ভাবে মোয়াজ্জেমকে স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানের মাধ্যমে ২০০০/= থেকে ৪০০০/= টাকার কয়েকটি কিস্তিতে একলক্ষ টাকা দেয়ার দায়িত্ব নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান, ১০নং অভিযুক্ত রুহুল কুদ্দুস এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন।[৩]

১৯৬৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাসায় মুজিবের নিকট থেকে ৭০০/= টাকা সংগ্রহ করেন।[৪]

১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর (পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধকালীন সময়) স্টুয়ার্ড মুজিব শেখ মুজিবের কাছ থেকে ৪০০০/= টাকা সংগ্রহ করেন।[৫]

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত গ্রুপের একটি বৈঠকে ঘটনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং শেখ মুজিবের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়।[৬]

---

১. সরকার দাখিলকৃত আনুষ্ঠানিক অভিযোগের ৬ষ্ঠ প্যারা।
২. পূর্বোক্ত, প্যারা-৭।
৩. পূর্বোক্ত, প্যারা-১২।
৪. পূর্বোক্ত, প্যারা-১৩।
৫. পূর্বোক্ত, প্যারা-১৪।
৬. পূর্বোক্ত, প্যারা-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচীতে মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে একটি মানচিত্র এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা দেন। এও বলে দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান চাইলে তাঁকে তা দিতে হবে।[৭]

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের হোটেল মিশকাতে সাক্ষী আমীর হোসেনের কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ১২নং অভিযুক্ত মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে জানান যে, শেখ মুজিবুর রহমান বিপ্লবী গ্রুপের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা উভয় গ্রুপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং মানিক চৌধুরী সাক্ষী আমীর হোসেনকে ৩০০০/= টাকা প্রদান করেন।[৮]

১৯৬৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে লেখা এক চিঠিতে মোয়াজ্জেম বলেন, তিনি পরশের (শেখ মুজিবুর রহমানের সাংকেতিক নাম) সঙ্গে সব কিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এখন ভয়ের কিছু নাই।[৯]

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ শেষে শেখ মুজিব চট্টগ্রামের এনায়েত বাজারের ১২নং রফিক উদ্দীন সিদ্দিকী লেনে অবস্থিত ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের বাড়ীতে একটি বৈঠক আহবান করেন। বৈঠকে আরো অংশ নেন স্টুয়ার্ড মুজিব, মানিক চৌধুরী এবং সাইদুর রহমান।[১০]

একই মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) শেখ মুজিবুর রহমান বিপ্লবী গ্রুপের জন্য আর্থিক সাহায্যের আর একটি উৎস আবিষ্কার করেন। ১১নং সাক্ষী মহসিন আগেই মুজিবকে অর্থ সাহায্য করে আসছিলেন। এবার মুজিব তাকে বিপ্লবী গ্রুপের জন্য অর্থ সাহায্য করতে বলেন। তদনুসারে দুই কি তিনদিন পর মহসিনের কাছ থেকে স্টুয়ার্ড মুজিব দুই কিস্তিতে ৭০০/= টাকা সংগ্রহ করেন।[১১]

১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক সহযোগী তাজউদ্দীন আহমেদ (যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন)-এর বাসায় বিপ্লবী গ্রুপের আরেকটি বৈঠক আহবান করেন। তাজউদ্দীন সে সময় বাসায় ছিলেন না। একটি ভ্যানে চড়ে আসা অংশগ্রহণকারীদের মুজিব একটি বাস স্টপ থেকে অভ্যর্থনা করে উক্ত বাসায় নিয়ে যান। মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব, রুহুল কুদ্দুস, এবং সাক্ষী আমীর হোসেন সেই বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে মোয়াজ্জেম আশা প্রকাশ করেন যে ডি.ডে (Day fixed for Operation) পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জনগণ তাদের পেছনে থাকবেন। অংশগ্রহণকারীদের সকলেই একমত প্রকাশ করেন যে, তাদের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত সকলকে অস্ত্র দেয়ার এবং অস্ত্রের ব্যবহারের প্রশিক্ষণ

---

৭. পূর্বোক্ত, প্যারা-১৯।
৮. পূর্বোক্ত, প্যারা-২০।
৯. পূর্বোক্ত, প্যারা-২১।
১০. পূর্বোক্ত, প্যারা-২৩।
১১. পূর্বোক্ত, প্যারা-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার চূড়ান্ত সময় এসে গেছে। ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনার জন্য কতিপয় প্রতিনিধিকে পাঠাবার বিষয়টিও বৈঠকে বিবেচনা করা হয়।[১২]

১৯৬৬ সালের ৩ এপ্রিল স্টুয়ার্ড মুজিব এবং সাক্ষী আমীর হোসেন শেখ মুজিবের বাসায় যান এবং তাঁকে বলেন যে, গ্রুপের ছোট অস্ত্র এবং গোলাবারুদ কিনতে আরো তহবিলের প্রয়োজন। শেখ মুজিবুর রহমান স্টুয়ার্ড মুজিবকে ৪০০০/= টাকা দেন এবং তিনি তা সাক্ষী আমীর হোসেনকে পৌঁছে দেন।[১৩]

১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল লেখা এক চিঠিতে মোয়াজ্জেম সাক্ষী আমীর হোসেনকে একটি বাজেট তৈরি করতে বলেন। আমীর হোসেন অস্ত্রের বিস্তারিত কারিগরি দিকটি সম্পর্কে জানতেন না বলে শেখ মুজিবুর রহমান না চাওয়া পর্যন্ত বাজেট তৈরি না করার সিদ্ধান্ত নেন।[১৪]

১২নং অভিযুক্ত মানিক চৌধুরী ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মুজিব সেখানে উপস্থিত ৪নং অভিযুক্ত সুলতানের কাছে টাকা দেয়ার জন্য মানিক চৌধুরীকে নির্দেশ দেন। তিনদিন পর সুলতান চট্টগ্রামে মানিক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি সুলতানকে তাদের কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫০০/= টাকা দেন।[১৫]

১৯৬৬ সালের ৬ মে শেখ মুজিবুর রহমানকে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন কতিপয় তৎপরতার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের[১৬] ৩২নং ধারা বলে গ্রেফতার করা হয়।[১৭]

একশত প্যারা সম্বলিত মামলার অভিযোগনামায় বাকী অংশে মুজিবের নাম উল্লেখ করা হয়নি কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি। ব্যতিক্রম ছিল কেবল তাঁর গ্রেফতারের পরে জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠক।[১৮] ১৪নং সাক্ষী কর্পোরাল জামিল বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক অফিসার তাদের তৎপরতা জোরদার করেন। এভাবে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্রের ৫১নং প্যারায় মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শেষ হয়। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, মামলার অভিযোগ অনুসারে ষড়যন্ত্রকারী এবং ভারতীয় অফিসারদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই যার এক বছরের বেশী সময় আগে থেকে শেখ মুজিব ছিলেন কারাগারে।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রামান্য দলিল হিসেবে ছিল :

---

১২. পূর্বোক্ত, প্যারা-২৮।
১৩. পূর্বোক্ত, প্যারা-৩২।
১৪. পূর্বোক্ত, প্যারা-৩৫।
১৫. পূর্বোক্ত, প্যারা-৩৭।
১৬. পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধের সময় নিবর্তনমূলক আটকাদেশের বিধান জারি করা হয়।
১৭. পূর্বোক্ত, প্যারা-৪১।
১৮. পূর্বোক্ত, প্যারা-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

১। ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে দেয়া মোয়াজ্জেম হোসেনের একটি ডাইরী যাতে ছিল সাংকেতিক নামের একটি তালিকা। সেখানে ৬ নম্বরে মুজিবের নাম দেয়া ছিল পরশ।

২। আমীর হোসেনকে লেখা একটি চিঠি যেখানে মেয়াজ্জেম লিখেছেন, 'তিনি পরশের সঙ্গে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এখন ভয়ের কিছু নাই।[১৯] মোজাম্মেল, সাইদুর রহমান এবং আমীর হোসেন ছাড়া মহসিন ছিলেন শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আর একজন সাক্ষী। তবে মহসিনের সাক্ষ্য মামলায় কোন সাহায্য করেনি এবং বাকী তিনজনকে অনুকূল বিবৃতি প্রদান এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপিত করায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৬ ও ৩৭নং ধারা বলে[২০] ক্ষমা ঘোষণা করে রাজসাক্ষী হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের পরামর্শে মুজিবও কৌশলগত কারনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। অভিযুক্ত কাউকে চেনেন না বা কাউকে তিনি অর্থ সাহায্য করেন নি দৃঢ়তার সাথে ট্রাইব্যুনাল কক্ষে নিজেকে নির্দোষ হিসেবে তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমেদ বলেন, "যদিও মুজিব সর্বাংশে সত্যি কথা বলেন নি.....মুজিব লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সুলতানউদ্দীন, কামালউদ্দীন, স্টুয়ার্ড মুজিব এবং গ্রুপের নেতৃস্থানীয় আরো কয়েকজনকে গ্রেফতার হওয়ার আগে চিনতেন না এটা ঠিক নয়। এটাও ঠিক নয় যে, তিনি তাদের সঙ্গে কোনো বৈঠকে মিলিত হননি অথবা তিনজন উচ্চপদস্থ বাঙালি সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেননি। এ ব্যাপারে খুব একটা সন্দেহ ছিল না যে মুজিব ও উক্ত গ্রুপের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।"[২১]

"মুজিব ট্রাইব্যুনালের সামনে তাদের কারো সঙ্গে পরিচিতির কথা অস্বীকার করলেও পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাদের জানতেন এবং সাহায্য করেছেন।"[২২]

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর লেঃ জেনারেল গুল হাসান বলেছেন যে, শেখ মুজিব শুধু ষড়যন্ত্র করেন নি, তাকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয় (যদিও ট্রাইব্যুনাল রায় দিতে সময় পায়নি)।[২৩]

২৬নং অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলী সশস্ত্র পরিকল্পনায় শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বলেন, "আমি জানতাম যে, বঙ্গবন্ধু এই পরিকল্পনার মূল রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। আর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সামরিক সমন্বয়কারী। আমি আরো জানতাম যে, পাকিস্তানের তৎকালীন বিরাজমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বাধীন করার একমাত্র পথ ছিল সশস্ত্র বিপ্লব। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু আমাদের সশস্ত্র পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছিলেন। আবার জনগণকে ঐতিহাসিক ছয় দফার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচিও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মামলা

---

১৯. পূর্বোক্ত, প্যারা-২১।

২০. কাউকে ক্ষমা ঘোষণা করার বিধান।

২১. মওদুদ আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

২২. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

২৩. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, উদ্ধৃতি, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬২ (টিকা ও পাঠপঞ্জি)।

Dhaka University Institutional Repository

চলাকালীন একদিন কৌতুহল ছলে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি সশস্ত্র পরিকল্পায় সত্যিই জড়িত ছিলেন কিনা, শেখ মুজিব মৃদু হেসে উত্তরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ' এবং আমার পিঠ চাপড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি জানেন যে, আমিও সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে জড়িত এবং তিনি তার জন্য গর্বিত।"[২৪]

আইউব খানের সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন বাঙালি ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান (পরবর্তীতে B.N.P. এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বর্তমানে পরলোকগত) এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, "মামলার তদন্তে আগরতলা মামলার সত্যতার অনেক দলিল ও তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। আজকের গৌরবের কাহিনী হিসেবে তা আমাদের কছে বিরাজমান। শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অবস্থার কিছু খুঁটি নাটি দিকে জড়িত ছিলেন। এর বেশী কিছু তাঁর বিরুদ্ধে পাওয়া যায়নি। তবে আমার অভিমত ছিল, এই মামলায় শেখ মুজিবকে না জড়ানোর। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান ছাড়লেন না। তিনি ভাবলেন শেখ মুজিবকে শায়েস্তা করার জন্য মোক্ষম অস্ত্র পাওয়া গেছে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। তিনি ভেবেছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে শেষ করে দেয়া যাবে। কিন্তু মোনায়েম খানের চিন্তা ছিল ভুল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে 'পিন্ডির ষড়যন্ত্র' বলে গ্রহণ করেছিল। দ্রুতই এর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অবস্থান গ্রহণ করে এবং শেখ মুজিব 'বীর' হিসেবে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।"[২৫]

এক কালের ছাত্রনেতা বর্তমানে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক এম,পির নিকট থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় ১৯৬৫ সনে। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'ছাত্রলীগকে সংগঠিত করো। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে এক রাষ্ট্রে থাকা যাবেনা। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমরাও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। ১৯৬২ সন থেকে আমাদের স্বাধীনতার চিন্তা এবং স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু সবই জানতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক নির্দেশ আমরা পাই ১৯৬৫ সনে। ১৯৬৬ সনে ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করলেন। ৬ দফার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের সকলকে আরো উৎসাহিত করে। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার কারণে স্বাধীনতার ধারণা আরো স্বচ্ছ এবং ব্যাপকতর হয়। জনগণ স্বাধীনতার ধারণার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন প্রদান শুরু করে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের কারণে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ মামলার

---

২৪. কর্নেল শওকত আলী, সাক্ষাতকার ১৫-০৯-২০০২, পূর্বোক্ত, আরো, *Armed Quest for Independence*, op. cit., PP. 96-97.

২৫. ড. মুহাম্মদ হাননান, *বাঙালীর ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

সকল আসামী মুক্তি পান ১৯৬৯ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল সংবর্ধনা সভায় মুজিব ভাইকে জনগণের পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর কিছুদিন পরই 'বঙ্গবন্ধু' আমাদের ডেকে পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।[২৬]

তিনি আরো বলেন, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত ও প্রাক্তন বাঙালি অফিসার ও সৈনিকেরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে এরকম তথ্য বঙ্গবন্ধু নিজেই আমাদের দিয়েছিলেন ১৯৬৫ সনে। পরিকল্পনাটি সফল ভাবে বাস্তবায়িত হলে অতিশয় কম রক্তপাতে এবং হয়তোবা কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতো। পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার কারণে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্তপাত বেশী হয়েছে। কিন্তু দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যোগ বৃথা যায়নি। এই মামলার মাধ্যমেই সমগ্র বাঙালি জাতির কছে স্বাধীনতার ধারণা পৌঁছে যায়। বিশেষ করে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনার সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তোলে।"[২৭]

আব্দুর রাজ্জাকত এম.পি. অন্যত্র বলেছেন, "১৯৬৮ সালের শেষের দিকের ঘটনা। হঠাৎ একদিন বেশ কয়েকজন সাবেক সেনা অফিসার, নন কমিশন্ড লোককে নিয়ে আসা হলো আমাদের সেলে। ১৭-১৮ খাটের জায়গায় ২৯-৩০ টি ফেলা হলো। আমরা বেশ অবাক। হঠাৎ করে এতো সামরিক লোকজন ! এর মধ্যে একটা লোক আমাকে চিনল। স্টুয়ার্ড মুজিব একটু অস্থির চিত্তের লোক। আমাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'আপনাকে আমি চিনি। আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে।' তাঁর কথা থেকে অনেক কিছু বুঝে নিলাম। তাঁকে বললাম', এখন কোথায় দেখা হয়েছে সেকথা থাক। একদম চুপ, কোন কথাই বলবেন না। এ ব্যাপারে।' সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'লিডার কোথায় ?' বললাম 'আছে'। বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে।

পরের দিন বিকেলে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, 'কি হয়েছে ?, সে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সম্পূর্ণ বর্ণনা দিল। তাঁরা সবাই ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী। আমরা আগে থেকেই জানতাম, বঙ্গবন্ধুর কিছু এটা প্রিপারেশন আছে। সম্পূর্ণ জানতাম না। স্টুয়ার্ড মুজিবের কাছে থেকে সব শোনা হলো। স্টুয়ার্ড মুজিব জানালো সবাই ধরা পড়ে গেছে। তাঁকে বললাম, 'বাঁচতে হলে প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে। কোনভাবে যাতে তথ্য ফাঁস না হয়। বিশেষ করে লিডারের নামের ধারে কাছেও যাবেন না। তাদের সাথে বি.ডি.আর, নেভী, এয়ার ফোর্স এর লোক ছিল, পরিচয় হলো। সবাইকে এক কথা বললাম।[২৮]

---

২৬. আব্দুর রাজ্জাক, সাক্ষাতকার ১১-৯-২০০৩।

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. আব্দুর রাজ্জাক, *বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা, সম্পাদনা আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার*, কাকলি প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৯৬, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কুদ্দুস মাখন বলেন, "যতই আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে তথাকথিত বলি, বঙ্গবন্ধু আগরতলা গিয়ে বৈঠক করেছেন এটা মিথ্যা নয়। মামলায় পাকিস্তান সরকার যা বলেছেন তার সব সত্য নয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলাতেই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিংহের সাথে খেতে বসেছিলাম আমি এবং রব। শচীন বাবু স্বীকার করেছেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কুমিল্লা জেলার মুরাদ নগরের ড. আলীসহ মুরাদনগর ও ব্রাহ্মনবাড়িয়ার শিমরাইল হয়ে বঙ্গবন্ধু আগরতলা গিয়েছিলেন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে।[২৯]

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় শেখ মুজিব তাঁর নিকটতম বন্ধু-বান্ধবকে দুঃখ করে বলতেন, "We have lost a golden opportunity for waging a movement for liberating East Bengal. If we could communicate with India beforehand, we could free East Bengal from the control of West Pakistan."[৩০] "He also used to say that Pakistan was created through a conspiracy and another conspiracy was needed to undo it."[৩১]

"১৯৬২ সালে শেখ মুজিব রাজনৈতিক কাজে করাচীতে আসেন, তখন লেঃ মোয়াজ্জেম সি,আই,ডি ও পাকিস্তানী স্পাইদের চক্ষু এড়িয়ে লেঃ মোয়াজ্জেমের বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হন এবং জানান যে, 'এই বিপ্লবের কথা তিনি অনেকদিন ধরে চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।' বঙ্গবন্ধু আমাদের অর্থ ও লোকবল দিয়া সাহায্য করার অঙ্গীকার করেন"।[৩২]

"বঙ্গবন্ধু যখনই করাচী যেতেন তাঁর (মুজিব) সঙ্গে যোগাযোগ করতাম এবং বাঙালিদের উপর সশস্ত্র বাহিনীতে অন্যায়-অবিচারের কথা তাঁর কাছে তুলে ধরলে তিনি স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে এসবের প্রতিকার না হলে অগত্যা চূড়ান্ত ভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের সব কিছু আদায় করে নিতে হবে বলে আমাদের আশ্বাস দিতেন।[৩৩]

---

২৯. শহীদুল ইসলাম মিন্টু সম্পাদিত, *শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অজানা অধ্যায়*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৩-৩৪।

৩০. ABDUL WADUD BHUIYAN, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi-1982. P. 109

৩১. *Ibid.* 109

৩২. ব্রিগেডিয়ার খুরশিদ উদ্দীন আহমেদ, সাক্ষাতকার ০৩-০৫-০৩।

৩৩. ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুল জলিল, সাক্ষাতকার ২১-০৬-০৩।

মামলার ৮নং অভিযুক্ত কর্পোরাল আব্দুস সামাদ বলেন, "বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে একদিন আমাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত করলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৩৪]

অন্নদা শংকর রায় তাঁর বইতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "সেদিন আমাদের বিশ্বাস করে আরো একটি কথা বলেন শেখ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়ে নেন যে আমরা তা প্রকাশ করবো না। আমি এখন খেলাপ করছি ইতিহাসের অনুরোধে। আমি প্রকাশ না করলে কেউ কোন দিন করবে না। 'আমার কি প্ল্যান ছিল জানেন ? আমরা একদিন পাওয়ার সিজ করবো, ঢাকা শহরের সব কটা ঘাঁটি দখল করে নেব। আর্মিতে, নেভীতে, এয়ারফোর্সে, পুলিশ, সিভিল সার্ভিসে আমাদের লোক ছিল। কিন্তু একটা লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সব পণ্ড হয়। নেভীর একজন অফিসার বিশ্বাস করে তার অধীনস্থ একজনকে জানিয়েছিলেন, সে ফাঁস করে দেয়। তখন আমরা সবাই ধরা পড়ে যাই।' তিনি আক্ষেপ করেন। আমি প্রশ্ন করি, "ঘটনা ঘটতো কোন তারিখে ?" তিনি মৃদু হেসে উত্তর দেন, "বলবো না।"[৩৫]

উপরোক্ত ঘটনাবলী যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে "তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল একজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের যতটুকু থাকার ঠিক ততটাই। কোন সশস্ত্র বিপ্লবীর ন্যায় ভূমিকা হয়তো শেখ মুজিবের ছিল না।[৩৬]

সশস্ত্র পরিকল্পনায় শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে অনেক সচেতন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্দেহ বা নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। এখানে এ ধরনের কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

"মামলায় অভিযুক্তদের প্রত্যেকেই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন এবং বলেন যে বর্ণিত আগরতলা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানতেন না।"[৩৭]

"শেখ সাহেব এ ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না।"[৩৮]

"শেখ মুজিবের পক্ষে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রের' সাথে যুক্ত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।"[৩৯]

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শেখ মুজিব সহ সকল অভিযুক্ত নিজেদের নির্দোষ হিসেবে দাবি করার ফলে সশস্ত্র পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টির সত্যতা যথেষ্ট ভাবে প্রমাণ করে না। আর যে কোন সশস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তিই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে

---

৩৪. কর্পোরাল আব্দুস সামাদ, সাক্ষাতকার ০৫-০৫-২০০৩।

৩৫. অন্নদা শংকর রায় ,*আমার ভালবাসার দেশ*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১, ঢাকা পৃ. ১৬৫।

৩৬. মওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

৩৭. প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩।

৩৯. পূর্বোক্ত, ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। সেটিই স্বাভাবিক। শেখ মুজিবসহ ৩৪ জন অভিযুক্ত সকলেই তাদের আইনজীবীদের অভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে তাদেরকে নির্দোষ এবং ঘটনার বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না' বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করলেই তাদের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টি যথেষ্ট প্রমাণ করে না।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেন, "শেখ মুজিব ঘরোয়া আলোচনায় খুবই ঘনিষ্ট দু'একজনের কাছে প্রকাশ করেন, তিনি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন না।[৪০]

শ্রদ্ধেয় আব্দুল গাফফার চৌধুরীর এ উক্তির সঠিক জবাব পাওয়া যাবে পূর্বে উল্লেখিত অন্নদা শংকর রায়ের লিখনীসহ অন্যান্য লিখনীতে।

'সশস্ত্র পরিকল্পনায় শেখ মুজিব সায় দিতে বিরত থাকেন',[৪১] শ্রদ্ধেয় আবুল মাল আব্দুল মুহিত অবশ্য একই বইতে স্বীকার করেছেন যে, সীমিত তথ্যের উপর নির্ভর করে তিনি ঐ বিবরণ দিয়েছেন (পৃ. ১৬২)। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, সশস্ত্র পরিকল্পনাকারীদের পরিকল্পিত ঘটনার সত্যতা বা এর গভীরতা খোঁজার চেষ্টা তিনি করেন নাই।

আসাদুজ্জামান আসাদ তাঁর লিখায় প্রকাশ করেছেন, "নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী শেখ মুজিব কোন গোপন আঁতাতের মাধ্যমে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা লাভ করতে চাননি। কাজেই সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় তাঁর ক্ষমতা দখলের বিষয়টি অবান্তর।"[৪২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বা সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন কিছুতেই পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল ছিল না। পুরো পরিকল্পনার লক্ষ্য যদি হতো 'পেছনের দরজা' দিয়ে ক্ষমতা দখল, তবে সশস্ত্র পরিকল্পনাকারীরা কোন গণ নেতৃত্বের কাছে তাদের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করতেন না। আর শেখ মুজিবও জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়েও তাদের পরিকল্পনার প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন দানে উৎসাহিত হতেন না। তাই 'পেছনের দরজার' প্রসঙ্গটিই এখানে অবান্তর।

আর গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যারা বলতে চান যে, আজীবন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণমানুষের নেতা, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, অপরিসীম মনোবল, সংযম ও আপোষহীন রাজীনীতিবিদ, জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী মুজিব কখনই সশস্ত্র পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন দিতে পারেন না।

এ সম্বন্ধে বলা যায় সশস্ত্র পরিকল্পনাকারীরা যে গভীর দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের ঝুঁকিকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র পরিকল্পনা প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার প্রতি শেখ মুজিবের সমর্থন না থাকার কথা নয়। কেননা মুজিব যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন পূর্ব বাংলার মুক্তি, সশস্ত্র

---

৪০. আব্দুল গাফফার চৌধুরী, *বাংলাদেশ সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসির লড়াই*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯২ পৃ. ৫০।

৪১. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

৪২. আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৪, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনাকারীরাও একইরূপ স্বপ্ন থেকেই পরিকল্পনা প্রণয়নের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সশস্ত্র পরিকল্পনাকারীরা যখন তাদের পরিকল্পনার কথা শেখ মুজিবকে জানান, তিনি তখন সমর্থন দিতে দেরী করেন নাই।

শেখ মুজিব সারা জীবন ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী। তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল গণ মানুষের কল্যাণ ও বাঙালি জাতির মুক্তি। কিন্তু পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কবল থেকে এই মুক্তি অর্জন যে সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সম্ভব নয় তা তিনি জানতেন। তাই একটা পর্যায়ে এসে সশস্ত্র পন্থার প্রতি শেখ মুজিবের অন্বেষণ শুরু হয়। তিনি আরো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, "তাঁকে হয়তো বাংলার মুক্তির জন্য নেতাজী সুভাষ বসুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হতে পারে।"[৪৩] এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করবো ড. মযহারুল ইসলাম এর বক্তব্য। তিনি বলেন "বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান উপমহাদেশে একটি দিক থেকে দুজন মনীষীর মধ্যে অপূর্ব সদৃশ্য আছে। এদের একজন নেতাজী সুভাষ বসু অপরজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শ্রী বসু ভারতের স্বাধীনতার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন যে, সেই ব্যাকুলতা তাঁকে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এমনকি ব্রিটিশের শত্রু জাপানের সাথে হাত মিলিয়েও যদি সে সংগ্রাম করতে হয়, তবে সে পথে যেতেও তিনি সঙ্কোচবোধ করেন নি। দেশের জন্য এমন সুতীব্র আর্তি সবার মধ্যে থাকে না-নেতাজী এদিক থেকে এক অনন্য পুরুষ। অনুরূপ আর্তি, অনুরূপ ব্যাকুলতা সমগ্র আন্দোলনকে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে, শেখ মুজিবকে। শেখ মুজিবের এই আর্তি এই ব্যাকুলতা বাঙালির সার্বিক মুক্তির জন্য। তবে দুই নায়কের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একজন সহজেই সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আরেকজন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের শেষ পথটুকু পর্যন্ত বহুকষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে হেঁটে গেছেন-যখন সর্বশেষ প্রান্তে আর এক পদও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি, তখন সশস্ত্র সংগ্রামের আহবান জনিয়েছেন।"[৪৪]

"১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইউব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করার পর নভেম্বর মাসেই ময়মনসিংহে 'ইষ্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি' নামে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গঠিত হয় প্রথম সশস্ত্র দল। দলের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করা এ দলের মূখ্য কাজ। দলের তিনজন সদস্য জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও খন্দকার বজলুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সমর্থক এবং এ,এম, সাঈদ ছিলেন ন্যাপ দলীয় সমর্থক। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় এ পার্টি তার প্রথম শাখা খোলে। এরপর পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ভারতে চলে যায় অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ভারত থেকে তারা কিছু পোস্টার ও প্রচার পত্রও ছাপিয়ে আনে। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোওরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এদের তৎপরতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে

---

৪৩. সিরাজউদ্দীন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ভাস্কর প্রকাশনী ২০০১, ঢাকা, পৃ. ১১৭।

৪৪. ড. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ১০৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

'লিবারেশন ফ্রন্টের' কর্মীরা যোগাযোগ রাখতো এবং শেখ মুজিব তাঁদের অর্থ সাহায্য করতেন।"[৪৫]

শক্তিমান লেখক আহমদ ছফার লিখনী থেকে জানা যায়, "পঞ্চাশের দশকে বঙ্গবন্ধু মাওলানা ভাষানীর সফরসঙ্গী হয়ে গণচীনে গেলে ঔপন্যাসিক মনোজ বসুকে বলেছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ছাড়বেন।"[৪৬] এ সম্বন্ধে সাংবাদিক আব্দুল মতিন জানান, "শেখ সাহেব বললেন, "তিনি আইউবকে পরোয়া করেন না। জনগণের মনের কথা তিনি জানেন। এরপর কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি আইউব বিরোধী সংগ্রামে আগরতলাকে ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেন।"[৪৭] যদিও এটা ঠিক যে, আগরতলাকে মামলায় টেনে আনা হলেও সরকার পক্ষ এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারে নাই।

একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাজনীতিক শাহজাহান সিরাজ বলেন, "তখন রাত দেড়টা। সেখান থেকেই শেখ মুজিবের বাসায় যাই সবাই। তিনি তখনও জেগে। ভাবী পান খাচ্ছেন। শেখ সাহেব এসেই নিজের কথা বলতে শুরু করেন। যুক্তি দেখান, জনগণের সমর্থন থাকলেই স্বাধীনতা আসবে না। প্রয়োজন অস্ত্র ও আন্তর্জাতিক সমর্থন।"[৪৮]

অন্নদা শংকর রায় তাঁর বইতে আরো লিখেছেন, "সেদিন তিনি বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন। সাতজন আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে নিয়ে যেতে। তিনি তাদের সাফ বলে দিয়েছেলেন যে, "আগে স্বীকৃতি তারপর সম্মেলনে যোগদান।" এখন কি হয় দেখা যাক। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই পাকিস্তান দেয় স্বীকৃতি আর রাত পোহাতে না পোহতেই শেখ উড়ে যান লাহোরে। সেখানে পড়ে যায় সংবর্ধনার ধুম। শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি "বাংলাদেশের আইডিয়া প্রথম কবে আপনার মাথায় এলো ?" "শুনবেন ?" তিনি মুচকি হেসে বলেন, "সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎবসু চান যুক্ত বঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির একদেশ। বাঙালিরা এক হলে কিনা করতে পারবো। "They could conquer the world."[৪৯]

১৯৮৮ সালের ১৯ আগস্ট সংখ্যা সাপ্তাহিক একতায় জনাব বজলুর রহমান একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, "১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে মগবাজারে আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমরেড মনি

---

৪৫. ড. মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫, আরো মাহমুদুল বাসার, *সিরাজউদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব*, ট্রুভেস্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৪৬।

৪৬. মাহমুদুল বাসার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৪৮. শাহজাহান সিরাজ, *শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিবের অজানা অধ্যায়*, শহিদুল ইসলাম মিন্টু সম্পাদিত, শিখা প্রকাশনি, ঢাকা, পৃ. ৩১।

৪৯. অন্নদা শংকর রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

সিংহ, কমরেড খোকা রায়, বঙ্গবন্ধু, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও জহুর হোসেন চৌধুরী। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃদ্বয়ের সঙ্গে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়ার মোট ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকে তারা আইউব শাহীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং দেশ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত বলে একমত হন। দ্বিতীয় বৈঠকে খোকা রায় বলেন ; সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তিসহ মোট ৪টি জনপ্রিয় দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব বলে তাদের পার্টি মনে করে। শেখ মুজিব বলেন, 'এসব দাবি দাওয়া কর্মসূচীতে রাখুন, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু দাদা একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই, আমার বিশ্বাস গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এসব কোন দাবিই পাঞ্জাবীরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালিদের মুক্তি নাই।[৫০]

"প্রকৃত পক্ষে সেনাবহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার কর্মীসহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অফিসারদের পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার এই প্রাথমিক সশস্ত্র আয়োজন সত্য ও বাস্তব ছিল।[৫১]

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও একাত্তরের মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পাকিস্তানিদের একটি সাজানো মামলা হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রস্তুতি বা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু একাত্তরের অনেক আগে থেকে নিচ্ছিলেন এবং ভারত সরকার এ বিষয়ে শুধু অবগতই ছিল না, সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল"।[৫২]

মুজিব বাহিনীর তৎকালীন নেতা, জাসদের সভাপতি মরহুম কাজী আরেফ আহমেদ উক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন, "এই সত্য যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে ধরে নিতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর 'ক্রাক ডাউন' এর জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা কিন্তু আগে থেকেই জানতাম বঙ্গবন্ধু সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমাদের ছেলেদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কিভাবে হবে, অস্ত্র কিভাবে আসবে এ সব আগে থেকে ঠিক করা ছিল।[৫৩]

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন ছাড়া যে কোন ভাবেই সম্ভব হবে না তা মুজিব বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি গণতান্ত্রিক পন্থার সাথে সাথে সশস্ত্র পথেও তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। উপরের ঘটনাবলী তারই স্বাক্ষর বহন করে। আর মুক্তিযুদ্ধ কখনও সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন ছাড়া সফল হয় না তাও দেশে দেশে যত মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের মুক্তি সংগ্রামেও সশস্ত্র পন্থাকে অবধারিতভাবেই অবলম্বন করতে হয়েছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিরাট সফলতা অর্জন করার পরও আমরা

---

৫০. সাপ্তাহিক একতা, ১৯ আগস্ট সংখ্যা, ১৯৮৮ ইং।

৫১. ফয়েজ আহমদ, *'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৫২. প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কোন সুযোগ পাই নাই। শেষাবধি মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের সশস্ত্র পন্থাকেই অবলম্বন করতে হয়েছে। পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামমুখর অধ্যায়ে মুজিব রাজনৈতিক ভাবে জনগণকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছেন, গোপনে তেমনি সশস্ত্র পরিকল্পনার প্রতিও সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। কেননা তিনি জনতেন, উভয় পন্থার সমন্বয় সাধন ব্যতীত বাংলার মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ তার প্রমাণ।

শেখ মুজিবের সারা জীবনের রাজনীতির লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার মুক্তি অর্জন। আর এ লক্ষ্যে তিনি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন নাই যার মাধ্যমে বাংলার মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। তবে সকল পন্থাই ছিল গণ সম্পৃক্ত। এখন আমরা শেখ মুজিবের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এমন কিছু কৌশলের উল্লেখ করবো যেখানে আমরা এক নতুন মুজিবকে আবিষ্কার করবো। তথাপি আমাদের কাছে বিস্ময়কর ভাবে উন্মোচিত হবে যে, শেখ মুজিবের শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলার মুক্তি। বংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাদের সাথে নিয়ে তিনি যেকোন উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন নাই।

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি চরিত্রের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা কখনই তার নিজের বা পরিবারের জন্য ছিল না, তার সবটাই জুড়ে ছিল বাংলার স্বাধীনতা ও বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের জন্য। বিশ্বের সর্বযুগে সর্বকালে যাদের দ্বারা পৃথিবীর কোন না কোন বৃহৎ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তাদের সবারই ব্যক্তিচরিত্রে প্রায় একইরূপ ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয়।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্যে রাজনীতির অনুমতি প্রদানের পর থেকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটায়। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জি, ডব্লিউ চৌধুরীর(ইয়াহিয়ার মন্ত্রিসভার বাঙালি সদস্য)'The Last Days of United Pakistan' গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে মুজিবের এক আলাপ চারিতার একটি টেপ...শোনানো হলো ইয়াহিয়াকে। মুজিব স্পষ্ট কণ্ঠে বলছিলেন 'আমার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হবার সাথে সাথে আমি এল,এফ, ও টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলবো। নির্বাচন হবার পর আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে কে" ? আর এ সম্পর্কে লেখক মাসুদুল হককে দেয়া সাক্ষাৎকারে জি. ডব্লিউ, চৌধুরী বলেন, "সহকর্মীদের সঙ্গে মুজিবের টেপ রেকর্ডকৃত কথাবার্তা আমি নিজ কানে শুনেছি। পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর গাড়ির ভেতর ক্যাসেট বসিয়ে রেখেছিল। ঐ ক্যাসেট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ক্যাসেটে তার সহকর্মী তাজউদ্দীন আহমেদ বলেছিলেন, 'আপনি কি করে এল,এফ ওর মতো একটি দলিল সমর্থন করলেন, যাতে লেখা আছে, শাসনতন্ত্র পুরোপুরি গঠন করা হবে না যতক্ষণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এতে রাজী না হন।' তখন তিনি বলেছিলেন, 'শুধু নির্বাচন দেয়ার জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। নির্বাচন হয়ে গেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ থাকবে না। এবং তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর যে রকম মোহাম্মদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

জিন্নাহকে বৃটিশ সরকার ও হিন্দু কংগ্রেস বাঁধা দিতে পারেনি, তেমনি নির্বাচনের পর তিনি বাঙালি জাতির একচ্ছত্র নেতৃত্ব পাবেন এবং তখন তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই এই বক্তব্য অনুযায়ী এল, এফ, ওকে একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি একথা সত্যিকার অর্থে বলেছিলেন নাকি তাঁর দলের চরমপন্থীদের খুশী করার জন্য বলেছিলেন, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি এসব বলেছিলেন, তা আমি নিজ কানে শুনেছি।" এর বিপরীতে শেখ মুজিবের সঙ্গেই জি, ডব্লিউ, চৌধুরীর আলাপচারিতায় লক্ষ্য করা যেতে পারে। "আমাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি যদিও তৎকালীন মন্ত্রীসভার যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলাম কিন্তু আমার আসল কাজ ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগ করা। আমার যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ছিল একটা আড়াল। আমি মন্ত্রণালয়ে খুব কমই যেতাম। আমার প্রধান কাজই ছিলো রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা। যেহেতু শেখ মুজিব ও মাওলানা ভাষানী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান নেতা ছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো। সুতরাং সঙ্গত কারণেই এই তিনজনের প্রতি বেশী মনোযোগ দেই। শেখ মুজিবের বাড়িতে বহুবার আমি গিয়েছি। এবং সেই সময় তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার সময় তিনি বারবার আমাকে বলেছেন, 'পাকিস্তান ভাঙ্গার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।' একদিন তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ছবি যেটা তার বাড়ীতে চোখে পড়ার মতো করে টাঙ্গানো ছিল সেদিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুগামী। পাকিস্তান ভাঙ্গতে পারি না। আপনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। তিনি কোনও দিনও পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিলেন না আমি তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে পাকিস্তান কখনোই ভাঙ্গবো না। আমার ছয় দফা ও পাকিস্তান দুটোই থাকবে।" আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শামসুর রহমানের সাথে শেখ মুজিবের আলাপচারিতায় তাজউদ্দীনকে বলা কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। "আরে মিয়া পাকিস্তানতো আলাদা-হয়ে যাচ্ছে," বলে তিনি উঠলেন পার্টি অফিসে যাবার জন্য। এ সময় পাশের রুম থেকে বেরিয়ে এলেন করাচী আওয়ামী লীগ নেতা মনজুরুল হক। তার দিকে ফিরে তিনি ইংরেজীতে বললেন, 'আপনি পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে বলুন তাদের উদ্বিগ্ন হবার কনো কারণ নাই, আমি পাকিস্তান ভাঙতে পারি না।[৫৪]

বাংলার স্বাধীনতা যেমন একদিনে আসে নাই তেমনি শেখ মুজিব একদিনে জনগণের নেতা বঙ্গবন্ধু হন নাই, একদিনে ধুমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। তিনি তিল তিল করে নিজেকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামের জন্য তৈরি করেছেন। নিজের পরিপূর্ণ সত্ত্বাকে সমর্পণ করেছেন বাংলার মেহনতি ও বঞ্চিত জনতার মুক্তির লক্ষ্যে। কঠোর ত্যাগ, আপোষহীন মনোভাব, স্বৈরশাসকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে গড়ে তুলেছেন বাংলার মুক্তির নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যখন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম ফলপ্রসূ হবার সকল বৈধ পথ বন্ধ করে নিশ্চিত করা হয়েছে স্বৈরশাসকের দখলদারী রাজত্ব কায়েমের অপচেষ্টা,

---

৫৪. মাসুদুল হক, *বাঙালী হত্যা ও পাকিস্তানের ভাঙ্গন*, সূচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৮৫-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

তখনই সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। এই দীর্ঘ সমস্যাসঙ্কুল পথ অতিক্রমে তাঁকে কখনও থাকতে হয়েছে ধীর স্থির আবার কখনও দেখা গেছে তাঁর অস্থির চিত্তের বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে আব্দুল গফফার চৌধুরীর বক্তব্যে 'বাংলাদেশ সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসির লড়াই' বই থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তাঁর কথায়, 'আমি কৌশলগত কারণেও এই মুহূর্তে গেরিলা যুদ্ধের অথবা সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি নেওয়ার পক্ষপাতী নই। তাতে পাকিস্তানের সামরিক জুন্টা সতর্ক হবে এবং পাল্টা আঘাত হানার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেবে। রাজনৈতিক দলও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। বাঙালি সিভিল ও মিলিটারী অফিসারদের নিষ্ক্রিয় ও চাকুরীচ্যুত করা হবে। ফলে আমরা এই মুহূর্তে যতটা এগিয়েছি, তার চাইতে দশ বছর পিছিয়ে যাব। কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সমর্থনও আমরা পাব না।....ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাব। নির্বাচন আদায় করে নিতে হবে, তাতেও কাজ না হলে অসহযোগ আন্দোলন। সর্বশেষে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই,পি,আর, পুলিশ, আনসার এবং সিভিল সার্ভিসের সমর্থনের দ্বারা আমরা সকলে একাত্ম হয়ে খাজনা দেয়া বন্ধ করলে অফিস-আদালত বয়কট করলে পূর্ব পকিস্তানের প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। আমরা যেহেতু সহিংস পন্থায় যাচ্ছি না, সেহেতু পাকিস্তানি আর্মি জুন্টার পক্ষেও শক্তি প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ বিশ্ব জনমত তখন থাকবে আমাদের পক্ষে।'[৫৫]

শেখ মুজিব বাংলার মাটি ও মানুষকে প্রতি মুহূর্তে জনবার ও উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। বাংলার গণমানসে শেখ মুজিবের যে ইমেজ গড়ে উঠেছে তা একদিনের প্রচেষ্টায় নয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তন, রাজনৈতিক গতি প্রবাহ এবং বলা চলে তৎকালীন পাকিস্তানের ২৪ বছরের গোষ্ঠীতন্ত্রের শাসনামলে। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, সরলতা, তেজোদীপ্ততা, দৃঢ়চিত্ততা সর্বোপরি জনগণের সামনে নিজের বক্তব্যের অকপটতা তাঁকে বাংলার মানুষের অন্তরে স্থান করে দিয়েছে। তাঁর শক্তির উৎস ছিল বাংলার জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও সমর্থন।

সুতরাং মামলায় শেখ মুজিব জড়িত ছিলেন না, বা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী মুজিব কখনও সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা পোষণ করতে পারেন না অথবা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে যারা তথাকথিত মামলা বলে আখ্যায়িত করতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য উপরের উদ্ধৃতিগুলি যথেষ্ট বলে মনে করা যায়। আর পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছেরের ইতিহাসে যতগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে প্রতিটি ঘটনার সাথে শেখ মুজিবের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলার স্বাধীনতার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল, আর শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে বা তাঁর অগোচরে এত বড় এক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। কেননা, সশস্ত্র পরিকল্পনাকরীরা যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল, শেখ মুজিবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একইরূপ। নিঃসন্দেহে সশস্ত্র পরিকল্পনাকারীরা ছিল

---

৫৫. আব্দুল গাফফার চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

দেশপ্রেমিক। পাকিস্তানের প্রবল পরক্রমশালী স্বৈরশাসনের অধীনে কর্মরত অবস্থায় তাঁরা জীবনবাজী রেখে উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন পূর্ব বাংলার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে। তাদের এই ত্যাগ ও উদ্দেশ্যের মূলে কোন অন্যায় ও অসততা ছিলনা--ছিলনা তাদের সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধারের কোন পরিকল্পনা। দেশের প্রতি ভালবাসা, দেশের জনগণের প্রতি ভালবাসাই তাদেরকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নিয়ে বাঁচার জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। গণমানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই তারা গণমানুষের নেতা শেখ মুজিবের সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিলেন। তারা জানতেন যে, গণমানুষের অংশগ্রহণ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারীদের যৌথ ভূমিকা পালন করা ছাড়া সে লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। গণমানুষের উদ্বুদ্ধ করণের জন্য শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচী পূর্ব বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচার করবেন আর সেইসাথে পরিকল্পনাকারীদের গোপন পরিকল্পনাও এগিয়ে চলবে এরূপ একটা অবস্থা। উভয়ের লক্ষ্য ছিল অনুকূল পরিবেশে 'অপারেশনে' ঝাঁপিয়ে পড়া। অনুরূপ আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের সময়। ফয়েজ আহমদের সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, "যখন পরিকল্পনাকারীদের অনুভূতি ও পূর্ব বাংলার গণমানুষের অনুভূতি এক হয়ে গিয়েছিল তখনই মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র পন্থার মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল"।[৫৬]

"পরিকল্পনাটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে অতিশয় কম রক্তপাতে এবং হয়তোবা কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতো। পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার কারণে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্তপাত বেশী হয়েছে। কিন্তু দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যোগ বৃথা যায়নি। এই মামলার মাধ্যমেই সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে স্বাধীনতার ধারণা পৌছে যায়। বিশেষকরে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনার সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তোলে।"[৫৭] তিনি আরো বলেন, "এই মামলার মাধ্যমে বাঙালি-জাতি জানতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক বাঙালী সামরিক, প্রাক্তন সামরিক এবং বেসামরিক ব্যক্তিগণ সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে এবং তাদের ফাঁসি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রচলিত বিচারের ব্যবস্থা করায় সমগ্র বাঙালি জতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ধারণা প্রকাশ্যে সমর্থন করা শুরু করে।"[৫৮]

এ প্রসঙ্গে ফয়েজ আহমদ এর লিখনী থেকে উদ্বৃতি দেয়া যায়। তাঁর কথায় "এমন সময় আকস্মিক ডাক, 'ফয়েজ এই ফয়েজ ; কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বিচারকদের দিকে চেয়ে রইলাম। একটু পরেই আমার ডান উরুতে শেখ সাহেব হাত বাড়িয়ে কিছু একটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেন। দেখলাম তাঁর সেই বিখ্যাত পাইপের আঘাত। নিশ্চই তিনি অভ্যাসের

---

৫৬. ফয়েজ আহমদ, সাক্ষাতকার ১৭-০৯-২০০৩।

৫৭. আব্দুর রাজ্জাক, সাক্ষাতকার ১১-০৯-২০০৩ ইং, পূর্বোক্ত।

৫৮. পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দাবিতে পাইপ আনতে অনুমতি পেয়েছিলেন। সাধারণতঃ কোর্টে এই সমস্ত অনুমতি দেয়া হয় না।...প্রস্তরমূর্তির যতো অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, 'মুজিব ভাই, কথা বলা মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।' তক্ষুনি উত্তর আসলো যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে।' তাঁর এই কথা ছিল রাজনৈতিক ও প্রতীক ধর্মী। স্তম্ভিত কোর্ট, সমস্ত আইনজীবী ও দর্শকগণসহ সরকারী অফিসাররা তাঁর এই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। প্রধান বিচারপতি একবার ডানদিকে ঘাড় বাঁকা করে শেখ মুজিব ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। কিছুই বললেন না। কোন সতর্ক উচ্চারণ ছিল না।.....বোধ হয় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, শেখ মুজিব এমন কারাগার, ভয়ভীতি, শঙ্কা ও ট্রাইব্যুনালের বিচারের মধ্যেও শেখ মুজিবই রয়ে গেছেন। তবে কিসের সমর্থনে শেখ মুজিবের এই মনোবল, তা তিনি এমন সুউচ্চ অবস্থান থেকে অনুমান করতে পারেন নি। তখন তিনি জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের বাণীস্বরূপ।[৫৯]

---

৫৯. ফয়েজ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৭
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

"তোমরা যারা রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে কারাগার থেকে আমাকে মুক্ত করেছ, যদি কোনদিন পারি, নিজের রক্ত দিয়ে তোমাদের সেই রক্তের ঋণ শোধ করব" কথাগুলো বলেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দশ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া সংবর্ধনা সমাবেশে।[১] আগের দিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি রক্তস্নাত ১১ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সহকর্মীদের নিয়ে মুক্তিলাভ করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গণআন্দোলন থেকে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটে সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বাংলা ও বাঙালির মুক্তিদাতা আর আইউব খান হারান তাঁর এক দশকের ক্ষমতার মসনদ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব বাংলার পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। বাঙালিরা আইউব খানের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর মুখোশ উন্মোচন করার শপথ নেয়। পূর্ব বাংলার সুপ্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচন্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। আইউবের মসনদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয়। মামলা শেষ না হতেই গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

১৯৬৮ সালের ৭ নভেম্বর একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাওয়ালপিন্ডি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।[২]

ছাত্র-পুলিশ সংঘাতের এক পর্যায়ে একজন ছাত্র গুলিতে প্রাণ হারায়। এ পরিস্থিতিতে জুলফিকার আলী ভূট্টো ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়ালে তাঁর জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যায়। সরকার

---

১. তোফায়েল আহমেদ, *বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি*, দৈনিক প্রথম আলো, শুক্রবার সংখ্যা, ১৫ আগস্ট, ২০০৩।

২. গর্ডন কলেজের কতিপয় ছাত্র গিয়েছিল আফগান সীমান্তে এবং লান্ডিকোটালের শুল্ক মুক্ত বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে। ফিরতি পথে তাদের শুল্ক বিভাগ আটক করে ও তাদের ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করে। লান্ডিকোটালের বাজারে সাধারণত বড়লোক অথবা ক্ষমতাশালীরাই কেনাকাটা করতেন এবং শুল্ক বিভাগ এতে কোনো ওজর আপত্তি করতো না। এই বৈষম্যমুলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করে কলেজের ছাত্ররা। একই দিনে পিন্ডি পলিটেকনিকের ছাত্ররা প্রতিবাদ করে তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে । আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, পূর্বোক্ত পৃ. ১৫৩। আরো, সংকলন ও সম্পাদন : নূরুল ইসলাম, *একাত্তরের ঘাতক দালাল যা বলেছে, যা করেছে*, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, ১৯৯১, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ভূট্টোকে গ্রেপ্তার করলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বাড়তে থাকে। '১৭ নভেম্বর এয়ার-মার্শাল আসগর খান এবং ২৬ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করলে জনগণ আরো সাহসী হয়ে উঠে, কারণ তাঁরা উভয়েই ছিলেন নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। আইউব খান দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। যদিও পূর্ব থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি অশান্ত ছিল।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতেই পাকিস্তানের উভয় অংশে গণআন্দোলন ভিত্তিক সংগ্রাম ঘনীভূত হতে থাকে। এ সময়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১নং অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে গোপনে জনৈক সাংবাদিকের মাধ্যমে কাগমারীতে অবস্থানরত মওলানা ভাষানীকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য চিরকুটের মাধ্যমে অনুরোধ জানান।[৩] শেখ মুজিব বুঝেছিলেন যে, ভাষানীর মত প্রথম শ্রেণীর গণসম্পৃক্ত কোন নেতা আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা না নিলে জনগণের আন্দোলন অগ্নিমুখী হয়ে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হবে না।

শেখ মুজিবের আহবানে সাড়া দিয়ে মাওলানা ভাষানী গণআন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তা ছিল অসামান্য ও মৌলিক। তিনি পুরো আন্দোলনকালীন সময়ে জনগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করে তোলেন। সেলিনা হোসেন তাঁর উনসত্তরের গণআন্দোলন বইতে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি বর্ণনা দেন এভাবে, "এমনিতেই পূর্ব বাংলার বাতাসে বারুদ ছিল, ভাষানী দিলেন শলাকা। সে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো দিগ্‌বিদিগ্‌।"[৪] ১৮ নভেম্বর ঢাকার আইনজীবীরা, ২২ শে নভেম্বর ঢাকায় ১২ জন বুদ্ধিজীবী, ২৯ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র জনতার উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ মিছিল করে।[৫]

১ ডিসেম্বর ঢাকার সাংবাদিক সমাজের পক্ষে সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল্লাহ কায়সার, সাধারণ সম্পাদক আতাউস সামাদ, প্রেসক্লাব সভাপতি এ,বি,এম, মুসা প্রমূখ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন।[৬]

ডিসেম্বরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘটনা আন্দোলনকে অভ্যুত্থানে পরিণত করার শক্তি নিয়ে একের পর এক ঘটে যেতে থাকে। ১ ও ২ তারিখে ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করে। ২ তারিখে অটোরিক্সা চালকেরা ধর্মঘট আহবান করে। ন্যাপ ভাষানী এতে সমর্থন দেয়। ৬ ডিসেম্বর ন্যাপ ভাষানী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করে।। মাওলানা ভাষানীর জনসভায় গর্জন উঠেছিল, 'জেলের তালা ভাঙ্গবো শেখ মুজিবকে আনবো! সেদিন ভাষানী গভর্ণর হাউজ 'ঘেরাও'

---

৩. ফয়েজ আহমদ, সাক্ষাতকার ১৭-০৯-২০০৩।

৪. সেলিনা হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

৬. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। ৭ ডিসেম্বর স্কুটার ড্রাইভারদের দাবির প্রেক্ষিতে মাওলানা ভাষানীকে হরতাল ডাকতে হয়েছিল, যাতে ৩ জন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত ও ৫০০ লোক (আনুমানিক) গ্রেপ্তার হয়। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে বিরোধী দলও স্বতন্ত্র সদস্যরা মিছিল সহকারে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান।[৭] ৮ ডিসম্বের ১৯৬৮ দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় 'গণ আন্দোলনের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইউব খান : বিক্ষোভ করে সরকারকে টলানো যাবে না' শিরোনামের দীর্ঘ বক্তব্যের শেষে ১৯৫৮ সালের "বিপ্লবের" পর থেকে দেশের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার হয়েছে এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধই এর প্রমাণ।' পাকিস্তানের স্বৈরশাসক তাঁর খামখেয়ালী কর্মকাণ্ডে কতটা আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলতো, তা বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। সাধারণ জনগণের অবস্থান থেকে শাসকগোষ্ঠী অনেক দূরে অবস্থান করতো তাও এতে প্রমাণিত হয় (১৯৬৫ সালের যুদ্ধ এবং এর বাস্তব ফলাফল আমরা ইতিপূর্বে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি)।

৯ ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররমে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানে আরও ২০০ জন গ্রেফতার হয়। ১১ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সাংবাদিকের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকার সাংবাদিকরা ধর্মঘট পালন করে। ১৩ ডিসেম্বর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। আদমজী, টঙ্গী, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকাতেও হরতাল ধর্মঘট, মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন যোগায়। ১৭ ডিসেম্বর সম্মিলিত বিরোধী দলের কর্মীসভায় পুলিশের অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিচার-বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে পাবনায় ডি,সি, অফিস ঘেরাও করা হয়। নরসিংদীর হাতির দিয়াতেও ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচী পালিত হয়।

"ঊনসত্তরে এসে প্রচণ্ড রুদ্ররোষে ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ গণমানুষ যে রাস্তায় নেমে পড়লো তার বড় কারণগুলি হচ্ছে :

১। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ কর্তৃক পূর্বাঞ্চলকে দীর্ঘদিন অর্থনৈতিকভাবে শোষণ ও শিক্ষাখাতে নিরন্তর বঞ্চনা এবং অব্যাহত এই অবিচার থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ জন-জীবনে শ্রেণী দ্বন্দ্বের উদ্ভব-এ চেতনার বিকাশ।

২। বাঙালি রাজনীতিক, সামরিক অফিসার সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্রে মামলা দায়ের এবং ১৯ জুন ১৯৬৮ থেকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে শেখ মুজিবের বিচার শুরুর ঘটনা।

৩। বেতার ও টেলিভিশনে পুনরায় রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলাভাষার তথাকথিত সংস্কারের পুনঃ প্রচেষ্টা।

---

৭. সেলিনা হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫। আইউব খানের রাজত্বকালের দশ বছরের তথাকথিত সাফল্যের প্রচারে ডামাডোল এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।[৮]

কিন্তু এমন এক সংকটকালীন পরিস্থিতিতেও সকল বিরোধী দল ও সংগঠনকে একই প্লাটফর্মে একত্রিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবুও সকলকে একমঞ্চে শামিল করার জন্য আলোচনা শুরু করা হয়। 'ডিসেম্বর ১৯৬৮ এর মাঝামাঝি থেকে আলোচনার সূত্রপাত হয়। অবশ্য ছাত্রদের মধ্যে এ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৭ সাল থেকেই।'[৯]

১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ডাকসু কার্যালয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, (মতিয়া গ্রুপ), জাতীয় ফেডারেশনের এক অংশ, একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করে ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করে। সাধারণভাবে ১১ দফা ছিল নিম্নরূপ :

(১) বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) সার্বভৌম আইনসভাসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা।

(৪) পশ্চিম পাকিস্তানের 'এক ইউনিট' বাতিল করে বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুকে নিয়ে সাব-ফেডারেশন গঠন এবং সব প্রাদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।

(৫) ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা।

(৬) কৃষকদের খাজনা ও করের বোঝা লাঘব করা ; বকেয়া ঋণ মওকুফ ; সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল এবং পাট ও আখের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।

(৭) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস প্রদান এবং তাদের শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ; শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন বাতিল এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রদান করা।

(৮) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

(৯) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।

(১০) 'সিয়াটো' ও 'সিন্টো' ও পাক-মার্কিন-সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ-পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা।

---

৮. ড. মুহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

৯. পূর্বোক্ত, ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

(১১) সব রাজবন্দীর মুক্তিদান, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করা।[১০] শুরু হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি। ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি চলে গণ-আন্দোলন। এই প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানের আটটি বিরোধী দলের ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Democratic Action Committee) বা ডাক। ঐ জোটে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান ন্যাপ, পাকিস্তান মুসলীম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, জামিয়াতুন উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, এন. ডি.পি., পি.ডি.এম. প্রভৃতি আটটি দল যোগদান করেছিল। সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন (ডাক) এর আট দফা কর্মসূচির পূর্ণ বিবরণ যা পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ১০ জানুয়ারি ১৯৬৯ প্রকাশিত হয়।[১১]

৮ দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ : (সংক্ষিপিত)

১। ফেডারেল প্রকৃতির সংসদীয় গণতন্ত্র।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

৩। অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।

৪। পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা, সব কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ বাতিল।

৫। শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভূট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার।

৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার।

৭। শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং

৮। প্রেস ও পাবলিকেসন্স অধ্যাদেশ বাতিল করা, সংবাদ প্রকাশে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার, ইত্তেফাক, চার্টান, প্রোগ্রেসিভ পেপারস ইত্যাদিকে তাদের পূর্বতন মালিকের হাতে প্রত্যার্পন।[১২]

১৯৬৯ সালের এই আন্দোলনে সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন ডাক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। একদিকে ছাত্রদের ১১ দফা দাবি অন্যদিকে ডাকের কর্মসূচি উভয় মিলে সৃষ্ট আন্দোলনের কারণে দ্রুত তা জঙ্গিরূপ ধরণ করে। ১৭ জানুয়ারি বায়তুল মোকাররমে ডাক এর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব ঘোষিত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ছাত্র জনতার সাথে পুলিশের

---

১০. সংক্ষিপ্ত আকারে *ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম*, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃ. ৫৪৫-৫৪৬, আরো বিস্তারিত *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৮।

১১. আবুল মাল আবদুল মুহিত, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬২ (টিকা ও পাঠপঞ্জি)। আরো আট দফার বিবরণ পাওয়া যাবে *স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১।

১২. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ১৮ জানুয়ারি ছাত্র মিছিলে পুলিশের নির্যাতন, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ, রঙ্গিন পানি ছিটানো অব্যাহত থাকে। ১৮ জানুয়ারি দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় 'বিক্ষোভকালে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।[১৩] পুনরায় ১৯ জানুয়ারি দৈনিক পাকিস্তান, "ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ; লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ" শিরোনামে সংবাদ পরিবেশন করে।[১৪]

২০ শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় ছাত্রদের ওপর হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।[১৫]

২০ তারিখের ঘটনা আন্দোলনের পরিস্থিতিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে সেলিনা হোসেন বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় যে ছাত্রসভা আহবান করা হয় সেখানে হাজার হাজার ছাত্র লাঠি নিয়ে উপস্থিত হয়। শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে গিয়ে মিছিল রশিদ বিল্ডিং অতিক্রম করার সময় পুলিশ বাধা দেয় এবং অতর্কিতে গুলি ছোঁড়ে। ঘটনাস্থলেই ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) অন্যতম নেতা আসাদুজ্জামান গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। মুহূর্তে পারিস্থিতি ভিন্নরূপ ধারণ করে। একদিকে শোক অন্যদিকে বারুদ। ছাত্র সমাজের উর্ধ্বমুখী বজ্রমুঠিতে শপথের উচ্চারণ।"[১৬]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ জানুয়ারি হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল, ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল।

২১ জানুয়ারি দৈনিক পাকিস্তান 'আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোকসভা ও মিছিল' শিরোনামে সংবাদ পরিবেশন করে। একই দিন দৈনিক সংবাদ (২১ জানুয়ারি) 'প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল' শিরোনামে সংবাদ প্রচার করে।[১৭]

সেলিনা হোসেন তাঁর উনসত্তরের গণআন্দোলন বইয়ে ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯-এর বর্ণনা থেকে সেদিনের ভয়াবহতার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারা যাবে, "২৪ তারিখে ঢাকা শহরে যে ঘটনা ঘটে তা ছিল অসাধারণ অভূতপূর্ব। এ কারণে এ দিনটিকে পরবর্তী সময়ে 'গণ-অভ্যুত্থান' দিবস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষের ঢল প্লাবিত করে ফেলে রাজপথ, গণজাগরণের উত্তুঙ্গ জোয়ার। পুলিশ, ই,পি,আর, কুলাতে পারে না। গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনী। সেক্রেটারিয়েটের সামনে প্রথমে মৃত্যুবরণ করেন রুস্তম। পরবর্তী পর্যায়ে গুলিতে নিহত হন নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর। সমগ্র নগরী বিক্ষোভে কাঁপে।.....সন্ধ্যায় ঢাকা

---

১৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।

১৬. সেলিনা হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

১৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিল পত্র,২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫-৪১৭।

Dhaka University Institutional Repository

শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেনাবাহিনী তলব করা হয় ও সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।[১৮]

"উনসত্তরের এই গণ-অভ্যুত্থানের কেন্দ্রে ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা, শহীদ আসাদ ও মতিউরের জীবনদান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এই গণঅভ্যুত্থানের আশু ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।[১৯]

পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি পশ্চিম বাংলায়ও প্রভাব ফেলে। পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য আইউব সরকারকে সেনাবাহিনী তলব করতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে সরকারের নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে।

নতি স্বীকার করে আইউব খান আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা জানিয়ে দেয় যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলে রেখে কোন আলাপ-আলোচনা হতে পারে না।

৬ ফেব্রুয়ারি আইউব খান ঢাকা আসেন সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। ৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক পাকিস্তান 'ঢাকায় কৃষ্ণ দিবস' শিরোনামে সংবাদ পরিবেশন করে।[২০]

১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ত্যাগের পূর্বে আইউব খান আগরতলা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় সরকারের নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হন।

অনেকে মনে করেন এটি ছিল প্রধান আসামী শেখ মুজিবকে হত্যা করার পরিকল্পনা। গুলিতে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক কোনোমতে বেঁচে গেলেও জহুরুল হক মারা যান।[২১]

ঘটনা সম্বন্ধে সরকারি প্রেসনোটের জন্য দ্রষ্টব্য[২২]

১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। অগ্নিসংযোগ করা হয় বাংলা একাডেমী সংলগ্ন স্টেটগেস্ট হাউসে যেখানে বিচারাধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এম, এ, রহমান থাকতেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিনের বাসভবন, প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমদ, প্রাদেশিক পূর্তমন্ত্রী মংশোয়েপ্রুর সরকারি বাসভবনে প্রাদেশিক কনভেনশনে মুসলিম

---

১৮. সেলিনা হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

১৯. রাশেদ খান মেনন, *উনসত্তরের বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান, রাজনীতির কথকতা*, দৈনিক প্রথম আলো, শনিবার ১৫ জানুয়ারি ২০০৫।

২০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃ. ৪২০।

২১. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭।

২২. *দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, আরো, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, পৃ. ৪২৯।

Dhaka University Institutional Repository

লীগের সভাপতি খাজা হাসান আসকারী সরকারি বাসভবনেও আক্রমণ পরিচালনা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। লক্ষ লোকের বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারে পল্টনে মাওলানা ভাষানী সার্জেন্ট জহুরের গায়েবানা জানাজা পরিচালনা করেন।[২৩]

এমন এক পরিস্থিতিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের রিডার ডঃ শামসুজ্জোহা উন্মত্ত ছাত্রদের বুঝিয়ে শান্ত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পাকিস্তানি সেনারা তাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। মুহূর্তে ঘটনাটি ঢাকাসহ সর্বত্র প্রচার হয়ে যায়। সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে জনতার ঢল রাস্তায় নেমে আসে। ছিন্নমূল মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে প্রস্তুত হলো। পাক সেনাদের আশঙ্কা ছিল জনতা হয়তো সেনা ছাউনি আক্রমণ করবে। স্থানীয় সেনাপতি তাৎক্ষণিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে সরকারের কাছে বার্তা পাঠায়। ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব সামরিক বাহিনীর তিন প্রধানকে সামরিক শাসন জারি করতে উপদেশ দেন। তারা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরামর্শ দেন।[২৪]

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলায় শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ঐদিন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে আইউব খান পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল অভিযুক্তদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় "যেহেতু জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য সংঘাত পরিহার করার উদ্দেশ্যে সরকার ক্রিমিনাল ল' এমেন্ডমেন্ট (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ (১৯৬৮ সালের অধ্যাদেশ) বাতিল করা যথাযথ মনে করে। এই আইনের আওতায় শেখ মুজিবুর ও অন্যদের খালাস দেয়া হয়েছে।"[২৫]

আন্দোলনের মুখে আইউব সরকার কর্তৃক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের (অন্যান্যরাসহ) নিঃশর্ত মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে ডঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান,

"সাতকোটি মানুষের মহানায়ক হিসেবে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসলেন শেখ মুজিব। যে আন্দোলন তাঁর মুক্তি এনে দিয়েছে তার মূলে ছিল তরুণ ছাত্র-সমাজ ও শ্রমিক সম্প্রদায়।'৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব-বাংলার ছাত্র-সমাজকে আন্দোলনের জন্য সংঘবদ্ধ করতে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান ছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে 'আগরতলা

---

২৩. (১) ফয়েজ আহমদ, সাক্ষাতকার ১৭-০৯-২০০৩ ইং আরো, সেলিনা হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

২৪. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭।

২৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, ৪৩৪ পাতা। আরো *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে সরকার পক্ষের আরজি ও আসামীদের জবানবন্দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫। আরো, পাকিস্তান অবজার্ভার, ২২ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ষড়যন্ত্র মামলা' ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিব একটি জনপ্রিয় নামে পরিণত হলেন।[২৬]

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নায়ক তোফায়েল আহমদ ঘটনার মূল্যায়ন করেন এভাবেই, "১৯৬৯ সালের মহান গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আসাদ, মতিউর, রুস্তম, মকবুল এবং পরে সার্জেন্ট জহুর, ডঃ জোহা, আনোয়ারাসহ অনেকের রক্তের বিনিময়ে বাঙালির প্রিয় নেতাকে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে ২২ ফেব্রুয়ারী ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত করা হয়। কোন আত্মত্যাগই যে বৃথা যায় না তা আবার প্রমাণিত হয়।"[২৭]

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারী রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। ১০ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ডাকসু'র ভি.পি. ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ বাংলার জনগণের পক্ষ থেকে শেখ মজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। এ প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদের ভাষ্য,

"১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারী দিনটির কথা আমার আজও মনে পড়ে। কারণ আমার জীবনে ওটি ছিল একটি শ্রেষ্ঠ দিন। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ওই বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করার দূর্লভ সুযোগ আমার হয়েছিল। মনে পড়ে প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে সেদিন আমি সভাপতির ভাষণ দিয়াছিলাম আগে এবং প্রিয় নেতাকে সম্বোধন করেছিলাম 'তুমি' বলে। উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম 'যে নেতা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও যিনি বাংলার মুক্তির কথা বলেছেন, বাঙালি জাতির কল্যাণের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যিনি দ্বিধা করেননি, সেই নেতাকে আমরা একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করতে চাই। ১০ লক্ষাধিক লোক ২০ লক্ষাধিক হাত উত্তোলন করে বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় আমার এই প্রস্তাবের সম্মতি জানিয়েছিলেন। এভাবেই সংগ্রামী বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের সংগ্রামের বিশ্বস্ত নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।"[২৮]

"আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সৃষ্ট গণ আন্দোলন থেকে পূর্ব বাংলায় প্রথম ধ্বনি উঠে জাগো জাগো বাঙালি জাগো ,মুক্তি যদি পেতে চাও, হাতিয়ার তুলে নাও, মুক্তির একই পথ সশস্ত্র বিপ্লব। এই সব স্লোগানই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশকে কেন্দ্র করে উদ্ভাবিত ও উচ্চারিত হয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানের সময় তরুণ সংগ্রামীরা অনেক নতুন নুতন স্লোগান উচ্চারণ করেন, যা

---

২৬. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৮৬-৮৭।

২৭. তোফায়েল আহমেদ, *বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট সংখ্যা, ২০০৩।

২৮. পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির আলাদা অস্তিত্ব সরবে জানান দিয়েছিল। যেমন, 'পাকিস্তান না বাংলা, বাংলা, বাংলা ; তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা,মেঘনা, যমুনা,' 'জয় বাংলা' ইত্যাদি।"[২৯]

"১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান জনগণকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এতটা ঐক্যবদ্ধ করছিল যে, তারা গণঅভ্যুত্থানকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর হয়। 'বাংলাদেশ' নামকরণের বিষয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদেন। সেখান থেকে ফেরার পর আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, এ অঞ্চলের নাম কি হবে ? তিনি বলেছিলেন, যদি স্বাধীন করতে পারিস তবে সে দেশের নামকরণ করা হোক-- বাংলাদেশ। আমি অবশ্য তাঁকে বলেছিলাম, 'পূর্বদেশ' নামকরণ করার জন্যে। কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন নাই। আমি তখন 'পূর্বদেশ' পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ছিলাম। শেখ মুজিবের সাথে উক্ত কথোপকথোনের পর আমার 'অবজার্ভেশন' হলো শেখ মুজিব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই।"[৩০]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তা নিম্নের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্ট হয়। ২৬নং অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলীর মতে, "মামলা যতই এগুতে থাকে গণআন্দোলন ততই তীব্র হতে থাকে। ধীরে ধীরে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে আইউব খান এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং অভিযুক্তদের মুক্তি দেন।"[৩১]

জনাব আব্দুর রাজ্জাক এম.পি,এ. প্রসঙ্গে বলেন, "১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের কারণেই পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ মামলার সকল আসামী মুক্তি পান ১৯৬৯ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল সংবর্ধনা সভায় মুজিব ভাইকে জনগণের পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর কিছুদিন পরই 'বঙ্গবন্ধু' আমাদের ডেকে পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।"[৩২]

৮নং অভিযুক্ত কর্পোরাল এ,বি,এম, আব্দুস সামাদ বলেন, "১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের অভ্যুদয় ঘটেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষের মধ্য দিয়ে। ঐ মামলা চলাকালীন খবরের কাগজগুলির মামলার বিবরণী, বিশেষ করে দৈনিক আজাদের সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের 'ট্রাইবুন্যাল কক্ষে' বিস্তারিত প্রকাশ করেন অভিযুক্তদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কার্যক্রম,যা-বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবকে

---

২৯. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

৩০. ফয়েজ আহমদ ও সাক্ষাতকার ১৭-০৯-২০০৩, ঢাকা।

৩১. কর্নেল শওকত আলী, সাক্ষাতকার ১৫.০৯.২০০৩ইং।

৩২. আঃ রাজ্জাক সাক্ষাতকার ১১.০৯.২০০৩ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় মহানায়ক এবং বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলে শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত হন, মামলা প্রত্যাহারের পরের দিন সংবর্ধনা সভায়।"[৩৩]

৩০নং অভিযুক্ত মাহবুব উদ্দীন চৌধুরীর কথায় "মামলার নথি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, মোহাম্মদ আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আগরতলায় গিয়েছিলেন অস্ত্র নিয়ে আলোচনার জন্য। এছাড়া ১৯৪৮ সাল থেকে সিলেটের এক ব্যবসায়ী জনাব শরফউদ্দীন চৌধুরী, মোয়াজ্জেম আহমেদ চৌধুরী এবং এই মামলায় অভিযুক্ত জনাব রুহুল কুদ্দুস স্বাধীন বাংলার জন্য কাজ করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে মোয়াজ্জেম আহমেদ চৌধুরী একবার আগরতলায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে তখন যোগাযোগ হয়নি। প্রথমদিকে পাকিস্তানের এ উদ্দেশ্য কিছুটা সফলতা পেলেও এবং আমাদের আত্মীয় পরিজনরাও আমাদের সাথে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করবার পর্যায়ে চলে গেলেও, মামলা যতই অগ্রসর হয় এবং আমাদের আইনজীবীরা যখন ক্রমশ: পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার ও অন্যায় আচরণ প্রকাশ করতে থাকেন এবং এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান বুঝতে থাকেন তখন সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অংশ নেয়। আইউব খান মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।"[৩৪]

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পেছনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা কতদূর ছিল তা সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ এর সাক্ষাৎকার থেকেও কিছুটা উপলব্ধি করা যায় :

গণঅভ্যুত্থানের সূত্র হচ্ছে আগরতলা মামলা, যা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ব্যবধানে নির্বাচিত হয়। 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি তাও এই গণঅভ্যুত্থানেরই ফলশ্রুতি।...আগরতলা থেকে গণঅভ্যুত্থান, গণঅভ্যুত্থান থেকে ১৯৭০ এর নির্বাচন আর নির্বাচনের পরই মুক্তিযুদ্ধ। আগরতলা কেস ছাড়া এতগুলো ধাপ এত দ্রুত অতিক্রম করা যেতো না। এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মাওলানা ভাষানী শেখ মুজিবের চিরকুট পেয়ে সমগ্র পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত, বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে অভ্যুত্থান ঘটলো তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।...শেখ মুজিব যেখানে 'ইনভলবড' রইল। তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হলো। ভাষানী অভ্যুত্থান ঘটালো।[৩৫]

---

৩৩. কর্পোরাল এ.বি.এম. আব্দুস সামাদ, সাক্ষাতকার ঢাকা ০৫.০৫.২০০৩ ইং।

৩৪. মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী, সাক্ষাতকার ০৪.০৬.২০০৩ ইং পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৩৫. ফয়েজ আহমদ, সাক্ষাতকার ১৭-৯-০৩ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

আত্ম প্রত্যয়ের দৃঢ়তা আর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা মাত্র নয় মাসে বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে রাষ্ট্র সৃষ্টির সফলতা। পৃথিবীর মানচিত্রে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি অংশ এই সর্বপ্রথম সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামে আর্বিভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধের এই নয়মাসকাল সহসাই বাঙালির জীবনে আসেনি। দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ বাঙালির জীবনে এই ক্ষেত্র তৈরীতে সহায়তা করেছিল। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Rounaq Jahan এর লিখার উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে "One of the traumatic events of 1971 was the disintegration of Pakistan and the emergence of the new nation state. Bangladesh. The birth of Bangladesh was in many ways a unique phenomenon, for Bangladesh was the first country to emerge out of a successful national liberation movement waged against "internal colonialism" in the new states." [১]

প্রতিটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে থাকে অনেক আত্মত্যাগ ও ঘটনার সদম্ভ উপস্থিতি। সংগ্রামের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েই জন্ম হয় কোন কালজয়ী সৃষ্টির, একটি রাষ্ট্রের। এই সংগ্রামমুখর অধ্যায়ের প্রতিটি ঘটনাই সে দেশের ইতিহাসকে করে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত, যা যুগ যুগ ধরে সে দেশের মাহাত্ম্য বহন করে চলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও কোন একক ঘটনার ফসল নয়। বহুযুগ, বহুকালের ধারাবাহিক সংগ্রামের ফসল তা। এই সংগ্রামের প্রতিটি ঘটনাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অমূল্য সম্পদ, যা থেকে যুগ যুগ ধরে বাঙালি নব সৃষ্টির প্রণোদনায় সিক্ত হবে।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল ব্যাপী পাকিস্তানি শাসনামলে বাঙালিকে যে ঘটনাবহুল অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল তার মধ্যে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে করেছিল শাণিত, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। যদিও এ বিস্ময়কর ঘটনা থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়েছিল, তথাপি ইতিহাসে এ ঘটনার বিশদ আলোচনা খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না।

---

১. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, University Press Limited, Dhaka, 1980. P.-63.

Dhaka University Institutional Repository

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই মামলার রয়েছে এক গভীর ও বিস্ময়কর ভূমিকা। মামলায় যারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের পরিকল্পনা ছিল সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করা। নানা তথ্যসূত্রে এটি আজ প্রমাণিত যে, বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে এ পরিকল্পনা এগিয়ে যায় এবং তিনি এতে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা মোতাবেক যদি তা বাস্তবায়িত হতো, তাহলে হয়তো অনেক কম রক্তপাতে পূর্বেই বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার সম্ভবনা ছিল এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হতো। আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধুকে এ মামলার ১নং অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মামলার সরকারি নামকরণও করা হয়েছিল "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য" যদিও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুসহ মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার লক্ষ্যে মামলাটিকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" বলে প্রচার করেছিল। এর পেছনে আইউব খান তথা পাকিস্তানিদের লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিব ও অন্যান্য বাঙালি অভিযুক্তদের গণবিচ্ছিন্ন করে তাদের প্রতি জনগণের বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলা। কিন্তু তাদের এ অসৎ উদ্দেশ্য বুমেরাং হয়ে শেখ মুজিব ও অন্যান্য বাঙালি অভিযুক্তদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে। বাঙালিরা অভিযুক্তদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। বাঙালি এক বাক্যে তাদের মুক্তি দাবি করে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, যে সশস্ত্র পরিকল্পনার মাধ্যমে অভিযুক্তগণ বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে না হলেও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়। এ প্রসঙ্গে ফয়েজ আহমদ এর ভাষ্য এরূপ, "এই বিদ্রোহের উদ্যোগটি সত্য। তখন থেকে আমরা কিছু সংখ্যক রিপোর্টার মামলার জেরার অংশ, যাতে মামলাটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পত্রিকার রিপোর্ট উপস্থাপন করতে থাকি। জেনে শুনেও এখানে আমরা সত্যকে মিথ্যা বলেছি।[২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে স্ফূরণ ঘটে তা সর্বস্তরের বাঙালিকে একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পশ্চিমা শাসকদের শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কখনই যে পূরণ হবে না বাঙালির মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হয়। আসামীদের বক্তব্য এবং সাক্ষীদের জেরার মধ্য দিয়ে শোষকের নির্মমতার যে চিত্র তাদের কাছে উন্মোচিত হয়, তা তাদের দিব্য চোখকে খুলে দিয়ে তাদের মাঝে পৃথক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জোরালো করে। আর এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ সহজ পথে সম্ভব নয়, তাও তারা উপলব্ধি করে। তাই সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নাই এ কথা তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে। এই মামলা বাঙালিকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র পন্থা অবলম্বনের বিষয়টি গভীরভাবে ভাবতে শেখায়। সশস্ত্র পন্থায় স্বাধীনতা ফিরে পাবার প্রথম পদক্ষেপ ছিল এ মামলা। এক পাকিস্তানে বসবাস করেও বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ও সমান মর্যাদা

২. ফয়েজ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বঞ্চিত করার দুঃখবোধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই অভিযুক্তরা সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করে। একইভাবে সাধারণ বাঙালিকেও এ মামলা সে ভাবেই সশস্ত্র পন্থায় দেশ স্বাধীন করার প্রেরণা যোগায়। জাতিগত ভাবে এবং রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করার- এ ঘটনা।

মামলার প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিব এ মামলার পথ ধরেই বাঙালির মুক্তিদাতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য প্রথমবারের মতো স্লোগান উচ্চারিত হয় "জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো" "মহান জাতির মহান নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।" "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" শুরু হওয়ার আগেই যখন ব্যাপক গ্রেফতার ও বাঙালিকে হয়রানি করা শুরু হয়, তখন থেকেই তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অতঃপর মামলা শুরু হওয়ার পর যখন অভিযুক্তদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের খবর পত্র-পত্রিকায় বেরুতে থাকে, তখন বাঙালিদের ক্ষোভ আরো বাড়তে থাকে। যখন তারা জানতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ মামলার প্রধান অভিযুক্ত এবং তাঁরই নেতৃত্বে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তখন তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এভাবেই সাধারণ বাঙালিদের মধ্যেও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। প্রচন্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙালি সাংবাদিকরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রশ্নে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের 'ট্রাইব্যুনাল কক্ষে' এ ক্ষেত্রে দারুণ ভূমিকা পালন করে।৩

পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার কারণে স্বাধীনতা অর্জনে পরবর্তীতে রক্তপাত বেশি হয়েছে। কিন্তু দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ বৃথা যায়নি। এই মামলার মাধ্যমেই সমগ্র বাঙালির কাছে স্বাধীনতার ধারণা পৌঁছে যায়। বিশেষ করে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনার সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তোলে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর কয়েকজন রাজনৈতিক সহকর্মী, কয়েকজন বেসামরিক বাঙালি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং বেশকিছু সংখ্যক কর্মরত ও প্রাক্তন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের নাম "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" অভিযুক্তদের তালিকায় দেখে বাঙালিরা রোমাঞ্চিত হয়েছিল। মামলা চলাকালীন বাঙালিরা ভাবতে শুরু করে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। এর কারণ অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে মামলাটিকে সেভাবেই পরিচালিত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল যে, এই মামলার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বাঙালিদের অধিকারের প্রশ্ন এবং প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয় সাক্ষীদের জেরার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে জনগণের মাঝে প্রচার করা।

মামলার শুরু থেকে গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত শেখ মুজিবের প্রতি বাঙালিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সমগ্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ শেখ মুজিবই ছিলেন

---

৩. আব্দুস সামাদ, সাক্ষাতকার ৫-৫-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে। আন্দোলনরত বাঙালিদের রুদ্ররোষের উদগীরণ মামলাটিকে মাঝপথে সমাপ্তি টানতে বাধ্য করে। মামলার প্রধান বিচারপতি গণরোষ থেকে রক্ষা পেতে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করেন। প্রবল পরাক্রমশালী স্বৈরশাসক আইউব খান ক্ষমতার মসনদ ছাড়তে বাধ্য হন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য ১৯৭০ সালে প্রথমবারের মত সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সে নির্বাচনে শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু'র ইমেজ নিয়ে গোটা পাকিস্তানে বিপুল ব্যবধানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গঠন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। জনগণের ম্যান্ডেট পান। কিন্তু সামরিক শাসক ইয়াহিয়া ও তাঁর দোসররা এ ফলাফল মেনে নিতে পারেন নাই। তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতির মূলে কুঠারাঘাত হেনে জনগণের রায়কে বানচাল করার জন্য ভ্রান্ত কৌশল অবলম্বনে তৎপর হয়। শেখ মুজিব জনগণের রায়কে বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক সহনশীলতা নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে থাকেন। কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভাবতে থাকে, বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ পাকিস্তানের অনিবার্য ভাঙ্গন। তাই তারা পাকিস্তানের তথাকথিত ভাঙ্গন ঠেকানোর উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ওয়ালী ন্যাপের সভাপতি খান আব্দুল ওয়ালী খান বলেন, "এক অর্থে এর গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ, দেশ রাজনৈতিকভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।"[৪] শেখ মুজিব বুঝতে পারেন যে, সহজ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কোন ইচ্ছাই সামরিক শাসকদের নেই। সমগ্র বাংলা ও বাঙালি জনগণ শাসকদের দমন-পীড়ন নীতিতে অধৈর্য্য হয়ে উঠে। এমনি এক শ্বাসরুদ্ধকর সঙ্কটকালীন সময়ে "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম" বলে ৭ মার্চ শেখ মুজিব বাঙালিকে দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন, যা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণের কাছে একটি ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর অন্যতম হিসেবে আজও পরিচিত। ২ মার্চ ১৯৭১ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা দেশে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গা নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। শত শত লোক হতাহত হয়। এমনি এক দুঃসহ সময়ে ২৫ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাক-হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে রাত বাঙালির জীবনে আজও 'কালরাত্রি' হিসেবে পরিচিত। আজও বাঙালি সেই কালোরাতকে স্মরণ করে শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালায়। শুরু হয় গণহত্যা। ২৬ মার্চের (১৯৭১) প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সারাদেশে শুরু হয় বাঙালিদের প্রতিরোধ ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। পরবর্তী ন' মাস পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চলে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের

৪. প্রফেসর সালাউদ্দিন, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাধিনায়ক করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। "এই অস্থায়ী সরকারের অধীনেই ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছিল একটি অনিবার্য, অপরিহার্য উপাদান। তাই ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী থাকা সত্ত্বেও তার নামেই মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে শপথ নিতেন। বঙ্গবন্ধুর নামেই মুক্তিযুদ্ধ চলে। অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিলে।[৫]

তাই মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বাঙালির জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল ও বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অনেক ত্যাগ, অনেক জীবনদান, মা-বোনের সম্ভ্রম, দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যার বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান, অভ্যুত্থান থেকে '৭০ এর নির্বাচন, নির্বাচন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, যার পরিণতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা।"[৬] তাঁর এই বক্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অবশ্যম্ভাবীভাবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাংলাদেশের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা বা প্রভাব কতটা ছিল, তা অভিযুক্তদের সাক্ষাৎকার থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

মামলার ৮নং অভিযুক্ত কর্পোরাল এ. বি. এম. আব্দুস সামাদ সাক্ষাৎকারে বলেন, "সশস্ত্র এ যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না।"[৭] ২৯নং অভিযুক্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুল জলিল তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আগেও অনেকে বিক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছেন এবং ঘরোয়াভাবে আলোচনায় স্বাধীনতার কথা বলেছেন, কিন্তু বাঙালি জাতি সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাকে গ্রহণ করে এ মামলার মধ্য দিয়েই।"[৮] তিনি আরো বলেন, "বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন এবং সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত বাঙালিরা এগিয়ে না এলে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা তা কখনও সম্ভব হতো না।"[৯] ৩৪নং অভিযুক্ত ব্রিগ্রেডিয়ার খুরশীদ উদ্দীন আহমেদ সাক্ষাৎকারে বলেন, "আগরতলা মামলা না হইলে দেশ যে স্বাধীন হইতে পারে বাঙালিদের সে সম্বন্ধে ধারণাই ছিল না। ১৯৬৮ সালে বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিছুসংখ্যক নির্ভীক সেনা বাহিনীর সদস্যের দেশকে স্বাধীন করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে। আগরতলা মামলা না হলে স্বাধীনতা সংগ্রামেই হতো না।[১০] ৩৫নং অভিযুক্ত কমান্ডার আবদুর রউফ বলেন,

---

৫. ড. হারুন অর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬।
৬. ফয়েজ আহমদ, সাক্ষাতকার তাং ১৭-৯-০৩ ইং।
৭. কর্পোরাল এ. বি. এম. আব্দুস সামাদ, সাক্ষাতকার তাং ০৫-৫-০৩ ইং।
৮. ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল, সাক্ষাতকার ২১-০৬-০৩ ইং।
৯. পূর্বোক্ত।
১০. ব্রিগেডিয়ার খুরশিদ উদ্দীন আহমেদ, সাক্ষাতকার তাং ০৩-০৫-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

"ষাটের দশকের মাঝামঝিতে দুটি প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে যা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনে অনেক বিতর্কেরও সূত্রপাত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি এই যে, পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে কি বাঙালির জাতীয় অধিকার আদায় সম্ভব, নাকি অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই যে, নিরঙ্কুশ জাতীয় অধিকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকে সম্ভব, নাকি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে? আগরতলা মামলাটি সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন এই যে, দু'টি প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট জবাব এ মামলার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। এ মামলার অভিজ্ঞতাই বলে দিয়েছে যে (এক) আমাদের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং (দুই) স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের সশস্ত্র লড়াইয়ে নামতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যারা এই মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলাম, অভিযুক্ত না হলেও যারা আমাদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সম্পৃক্ত ছিলেন, তারাই সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কায়েমের পথিকৃৎ..... অগ্রবাহিনী। '৭০ এর নির্বাচনে এদেশের মানুষ ৬ দফাকে ভোট দিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই। '৭১ সালে অস্ত্র হাতে নিয়েছে তাদের প্রাণের এ আকাঙ্ক্ষাকে অর্জন করার জন্যই। এভাবেই মুক্তি সংগ্রামের উত্তরণ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধে। আগরতলা মামলার ভূমিকাটি এখানে অনন্য এবং সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট।"[১১]

প্রাক্তন পানি সম্পদ মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' প্রভাবকে নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেন :

প্রথমত : এই মামলার মাধ্যমে বাঙালি জাতি জানতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক বাঙালি সামরিক, প্রাক্তন সামরিক এবং বেসামরিক বিপ্লবী-গণ সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত : তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে এবং তাদের কঠোর শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রচলিত আইন সংশোধন করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে প্রহসনমূলক বিচারের ব্যবস্থা করায় সমগ্র বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ধারণাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করা শুরু করে।

তৃতীয়ত : ঐ মামলার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতি চরম ত্যাগ ও সাহসিকতার সাথে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

চতুর্থত : ঐ মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাঙালি জাতির যে বিজয় অর্জিত হয়, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে।

---

১১. কমান্ডার আব্দুর রউফ, সাক্ষাতকার ৩০-০১-০৩ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত : বঙ্গবন্ধুসহ উক্ত মামলার অভিযুক্তগণের পর্বত প্রমাণ দেশপ্রেম, অসামান্য বীরত্ব, অদম্য সাহসিকতা, দেশকে স্বাধীন করার দৃঢ়সংকল্প ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।"[১২]

১২. আব্দুর রাজ্জাক, সাক্ষাতকার, তাং ১১-০৯-২০০৩ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে শেখ মুজিবসহ পঁয়ত্রিশজন অভিযুক্ত যে সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান এবং তার উপদেষ্টাদের সম্যক ধারণা থাকলেও তারা মুক্তিকামী বাঙালিদের শোষণ বঞ্চনার গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে একটার পর একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকেন। প্রথমতঃ তারা মুজিবকে মামলার ১নং অভিযুক্ত করে সমস্ত বিষয়টিকে রাজনৈতিক রূপ দেন। দ্বিতীয়তঃ শেখ মুজিব বাঙালিদের কাছে কত বড় মাপের জনপ্রিয় নেতা ছিলেন তা তারা বুঝতে পারেন নি। শেখ মুজিব বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে আপোষহীন ছিলেন বলে পাকিস্তানিদের আক্রোশের লক্ষ্য বস্তু ছিলেন এবং সে করণেই শেখ মুজিবকে ১নং অভিযুক্ত করা হয়েছিল বলে বাঙালিরা ধরে নিয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ সশস্ত্র পরিকল্পনাকে 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে প্রচার করতে যেয়ে তাঁদের 'আগরতলা' শব্দটিকে যুক্ত করতে হয়েছে। একথা ঠিক যে, ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী 'আগরতলা' শব্দটি মামলার অভিযোগনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ অভিযোগ সত্য বলে ধরে নিলেও, বিরাট অভিযোগ নামার এ অংশটি ছিল খুবই ছোট এবং গুরুত্বহীন। পাকিস্তানিরা মনে করেছিল যে 'আগরতলা' শব্দটি শুনলেই বাঙালিরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে এবং তাদের ফাঁসি দাবি করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বাঙালিরা অভিযুক্তদের মুক্তি দাবি করেছিল, ফাঁসি দাবি করেনি। 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার ছিল দুরভিসন্ধিমূলক এবং 'আগরতলা' শব্দটির ব্যবহার ছিল আরো বেশী দুরভিসন্ধিমূলক। আর এসব কারণেই মামলাটিকে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলা হয়ে থাকে। কর্নেল শওকত আলীর সাক্ষাতকারের কিছু অংশ প্রাসঙ্গিক হিসেবে তুলে ধরছি। "অভিযোগ নামায় ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগের ঘটনা ঢাকায় হয়েছে বলে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে মামলার নামের পূর্বে আগরতলা শব্দটি ব্যবহার করা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যদিও আমাদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা সঠিক ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র শব্দটিতে আমার ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। কারণ আমরা কোন ষড়যন্ত্র করিনি। আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম, যা ছিল একটি দেশপ্রেমিক পদক্ষেপ। পাকিস্তানীরা যেমন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের দুস্কৃতকারী বলেছিল, একইভাবে এই মামলার অভিযুক্তদের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে পাকিস্তানীরা আখ্যায়িত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে আমরা ছিলাম দেশপ্রেমিক বাংগালী।"*

---

* কর্নেল শওকত আলী, সাক্ষাতকার ১৫-০৯-২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

মামলাটির সরকারি নাম "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য" থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানিরা সরকারি প্রচারযন্ত্রে মামলাটিকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামে বহুল প্রচার করেছিল। অভিযুক্ত পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ মামলাটিকে 'ষড়যন্ত্রমুলক' 'মিথ্যা' এবং 'তথাকথিত' বলে প্রমাণ করেছিলেন তাদের ক্ষুরধার জেরা ও যুক্তিতর্কের দ্বারা। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে প্রচারিত মামলার অভিযোগ নামায় যে সশস্ত্র পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা জানতে পেরে বাঙালিরা ভীষণ ভাবে রোমাঞ্চিত ও আশান্বিত হয়েছিল।

তবে এটি ঠিক যে, তৎকালীন বহুল প্রচারিত এই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'টিকে আজও অনেকে 'তথাকথিত' বলে হাল্কা বা সাজানো এরূপ উল্লেখ করতে চান, যা অভিযুক্তদের সশস্ত্র পরিকল্পানার সাহসী ও দেশপ্রেমমূলক অবদানকে খাটো করে। একইসাথে তা সত্যিকার ইতিহাসকে তুলে ধরতে ব্যর্থ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শেখ মুজিবসহ পঁয়ত্রিশজন অভিযুক্তের দেশপ্রেমকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করার কোনই সুযোগ নেই। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালের পরিক্রমায় ১৯৬৭-১৯৬৯ সালকে যেমন অবধারিতভাবে অতিক্রম করতে হয়েছে, তেমনি ১৯৬৭-১৯৬৯-এর সময়কাল ব্যাপী যে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সে ঘটনাকে উপেক্ষা বা অবহেলা করে সঠিক ইতিহাস কখনই লিখা সম্ভব নয়। ইতিহাসকে সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে গেলে আমাদের ১৯৬৭-১৯৬৯ সালের ঘটনার সম্মুখীন হতেই হবে। আর বর্তমান গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হলো, ১৯৬৭-১৯৬৯ সময়কালে ঘটে যাওয়া ঘটনা-যা অনেকের নিকট 'তথাকথিত' 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। যদিও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সশস্ত্র পরিকল্পনা হিসেবে ঘটনাটিকে ইতিহাসে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। এতে করে ইতিহাস বিকৃতির দায় থেকে কিছুটা হলেও জাতি পরিত্রাণ পেতে পরে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। অভিযুক্তরা গভীর দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যদি না উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ এতটা দুঃসাহসী হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হতো না। বাঙালিদের এ ঘটনা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদিত করে। অভিযুক্তদের দেখানো পথ ধরেই বাঙালি সাহসী হয়েছিল পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয়ে। আর এ কারণেই মামলায় অভিযুক্তদের স্বাধীনতার অগ্রসেনানী ও পথিকৃৎ বলে আখ্যায়িত করার দাবি রাখে।

মামলার অভিযুক্তগণ যে মহান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, তা তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে নয়, মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে ইতিহাসে স্থান দেবে। অভিযুক্তগণের দেশপ্রেমই তাঁদের পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ সম্বন্ধে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছিল। সবদিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বঞ্চিত করে রাখার হীন প্রচেষ্টা পরিকল্পনাকারীদের মনের গভীরে আঘাত করেছিল। এক দেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও দুই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্যের পাহাড় গড়ে উঠেছিল, তা প্রতিটি পর্যায়েই সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল সর্বাগ্রে, অত্যন্ত কাছ থেকে। আর সে কারণেই, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের চেয়ে বঞ্চণার কষ্ট অনুভব করেছিলেন তারা অত্যন্ত গভীরভাবে ও বহুপূর্বে। বঞ্চণার এ গভীর উপলব্ধিই তাদের সশস্ত্র পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। দেশমাতৃকার সাধারণ জনগণকে মুক্ত করতে এবং তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই অভিযুক্তগণ জীবন বাজী রেখে সশস্ত্র পরিকল্পনায় একাত্ম হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা শাসকের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে নিশ্চিত মৃত্যুর হীমশীতল স্পর্শকে উপেক্ষা করে যে পরিকল্পনায় তারা সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, তাকে কখনই ষড়যন্ত্র বলা যায় না। ষড়যন্ত্রই যদি হতো তাহলে তারা পূর্ব-বাংলার গণ নেতৃত্বের শরণাপন্ন হতেন না, জনগণের নেতা শেখ মুজিবও তাঁদের পরিকল্পনায় সম্মতি দিতেন না এবং দেশের আপামর জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করার দায়িত্ব নিতেন না।

বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে সশস্ত্র পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবার কারণে শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পনাটিকে 'ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করে। উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে মামলার অভিযুক্তদের 'ভারতীয় চর' হিসেবে চিহ্নিত করে জনগণকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং পাকিস্তানের শোষণ বঞ্চণার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার বাঙালিদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার গভীরতা পরিমাপ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যার কারণে তাদের মিথ্যা তথ্য সংযুক্ত করে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য নেতৃত্বশূন্য করে দেয়ার অপচেষ্টা করে। কিন্তু সত্যের কাছে মিথ্যা চিরদিনই মুখ থুবড়ে পড়ে। জনগণ শাসকের সাজানো অতিরঞ্জনকে বিশ্বাস তো করেইনি, বরঞ্চ তারা বিশ্বাস করেছিল ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে চিহ্নিত অভিযুক্তদের পর্বত প্রমাণ দেশপ্রেমকে। অভিযুক্তদের প্রতি সামরিক শাসকদের অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও নিশ্চিত মৃত্যুও তাদের দেশপ্রেম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। শত প্রলোভন সত্ত্বেও তারা অত্যাচারী শাসকদের কাছে মাথা নত করেননি। এভাবে দেশপ্রেমের পরকাষ্ঠা দেখিয়ে অভিযুক্তরা যে ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিলেন তা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। ইতিহাস বিস্মৃত হতে পারে না উক্ত ঘটনাকে। ঘটনার সত্যতা অনুধাবন করতে পেরে পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব স্তরের জনতা দেশপ্রেমিক অভিযুক্তদের মুক্ত করার জন্য যে অভ্যুত্থান ঘটায় তা ইতিহাস অস্বীকার করবে কোন সাহসে! তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এ ঘটনার পরপরই রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটে যায় একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী যা এ ঘটনাকে শিরোনামে আসতে কিছুটা বাঁধ সাধে। অনেক ঘটনার ঘনঘটা এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থান্ধতা এমন একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে নিয়ে যেতে অনেকটা ভূমিকা রাখে। যাতে করে সত্য ইতিহাস হয়ে যায় পথভ্রষ্ট।

কিন্তু বিলম্বে হলেও একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, দল, মত, গোষ্ঠী স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ইতিহাসকে তার সঠিক পথে চলতে দেয়ার দাবিতে সকলে সোচ্চার। কালের পরিক্রমায় জাতীয় জীবনে যে সকল অবিনাশী ঘটনা জাতিকে দিকনির্দেশনা দেয় তা একদিন স্বীকৃতি পাবেই। কায়েমী স্বার্থবাদীরা কিছুকালের জন্য ইতিহাসকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হলেও সত্যিকার ইতিহাস একদিন স্ব-গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবেই। আর এখানেই ইতিহাসের অমরত্ব।

আজ ইতিহাসের এমন একটি ঘটনা সরব আলোচনায় মুখর। প্রজন্ম আজ সত্য ও সঠিক ইতিহাস জানতে উদগ্রীব। ইতিহাসবিদদের পথ ভ্রষ্টতা, রাজনীতিবিদদের কুপমণ্ডুকতা এবং অভিযুক্তদের পরবর্তীকালীন কিছু সীমাবদ্ধতা এমন এক দেশপ্রেমমূলক ঘটনাকে আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু কালের বিচারে সময় সাপেক্ষ হলেও ইতিহাস তার বিবেচনায় যোগ্য ঘটনা ও যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য অবস্থান দিতে কার্পণ্য করে না। ইতিহাসে দেশপ্রেমিকদের স্থান অন্য কারো পক্ষে দখল করা সম্ভব নয়। আর ষড়যন্ত্রকারীর স্থান তাও ইতিহাস নির্ধারণ করে দেয় অত্যন্ত সচেতন ভাবেই। সময় এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস রচনার। একই সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। বর্তমান গবেষণা কর্মে যথাসাধ্য সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেটি করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণা থেকে এটিই বের হয়ে এসেছে যে, বাঙালি দেশপ্রেমিকদের সশস্ত্র পরিকল্পনাতে কোন ষড়যন্ত্রই ছিল না-ছিল শুধু গভীর দেশপ্রেম, যা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রবর্তী এক ধাপ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এ ঘটনা করেছে ত্বরান্বিত। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে উপেক্ষা করাতো দূরের কথা, এ ঘটনার রয়েছে এক বিশাল ও গভীর উপস্থিতি, যার অনিবার্যতাকে ইতিহাস কোন ভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপুঞ্জি

১। বই

Ayub Khan-*Friends; Not Masters*, Karachi-1967.

Colonel Shawkat Ali-*Armed Quest for Independence, Dhaka-2001.*

Keith Callard, *Pakistan: A Political Study*, London-1957.

Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, 1982.

Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics; Problems and Issues*, Bangladesh-1980.

অন্নদা শংকর রায়, *আমার ভালবাসার দেশ, ঢাকা-২০০১।*

অনুবাদ : মোস্তাক হারুন, *রাও ফরমান আলীর ডাইরী অবলম্বনে ভূট্টো, শেখ মুজিব, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭।*

আব্দুল হক : *লেখকের রোজ নামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩, নূরুল হুদা সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৯৬।*

আব্দুল কুদ্দুস মাখন, *শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অজানা অধ্যায়, শহিদুল ইসলাম মিন্টু সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০১।*

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, ঢাকা, ২০০০।*

আব্দুল গাফফার চৌধুরী, *বাংলাদেশ সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রাসির লড়াই, ঢাকা-১৯৯২।*

আব্দুর রাজ্জাক, *বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা, সম্পাদনা আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, ঢাকা-১৯৯৬।*

আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি, ঢাকা-১৯৯৪।*

কমান্ডার আব্দুর রউফ *আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন, ঢাকা-১৯৯২।*

কামাল হোসেন (ড.) *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১, ঢাকা-১৯৯৪।*

প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা, ১৯৯৭।*

ফয়েজ আহমদ, *আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, ঢাকা, ১৯৯৪।*

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, ঢাকা, ১৯৯১।*

মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, ১৯৭৪।*

মওদুদ আহমদ, অনুবাদ, জগলুল আহমদ, *বাংলাদেশ, স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, ঢাকা ১৯৯২।*

মাহমুদুল বাসার, *সিরাজুদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব, ঢাকা, ১৯৯৭।*

মোহাম্মদ হান্নান (ড.) *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯২।*

মোহাম্মদ হান্নান (ড.) *বাঙ্গালীর ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৮।*

Dhaka University Institutional Repository

মাসুদুল হক, *বাঙালি হত্যা ও পাকিস্তানের ভাঙ্গন, ঢাকা ১৯৯৭।*

মেজর রফিকুল ইসলাম পি,এস,সি *শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৯৬।*

রাও ফরমান আলী খান, *বাংলাদেশর জন্ম, ভূমিকা মুনতাসির মামুন, ঢাকা, ১৯৯৬।*

মোস্তাক আহমেদ, *শহীদ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা,* প্রকাশক মোস্তাক আহমেদ, ৫/এ, নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা ১৯৮০।

শাহজাহান সিরাজ, *শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অজানা অধ্যায়,* শহিদুল ইসলাম মিন্টু সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০১।

সৈয়দ আলী নকী, *সমাজ বিজ্ঞানের পরিসংখ্যান পদ্ধতি, ঢাকা, ১৯৭৬।*

সেলিনা হোসেন, *উনসত্তরের গণআন্দোলন, ঢাকা-১৯৯৯।*

সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা, ১৯৮৩।*

সংকলন ও সম্পাদন, নূরুল ইসলাম, *একাত্তরের ঘাতক দালাল যা বলেছে যা করেছে, ঢাকা, ১৯৯১।*

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, *স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা, ১৯৮৭।*

সিরাজউদ্দিন আহমেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা, ২০০১।*

হারুন অর রশিদ, *বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০, ঢাকা. ২০০১।*

২। দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র--২য় খণ্ড।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র--১২ খণ্ড।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা--প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র, এডভোকেট সাহিদা বেগম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০০।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা--বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে সরকার পক্ষের আরজি ও আসামীদের জবানবন্দী, মহিউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা-১৯৭০।

Bangladesh Documents: Ministry of External affairs, Government of India, New Delhi-1971.

৩। পত্র-পত্রিকা

দৈনিক আজাদ,

দৈনিক পাকিস্তান,

দৈনিক ইত্তেফাক,

সাপ্তাহিক একতা,

দৈনিক জনকণ্ঠ,

দৈনিক প্রথম আলো।

Dhaka University Institutional Repository

৪। মামলার অভিযুক্ত বা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের সাক্ষাতকার

১। লীডিং সীম্যান আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ	৫নং অভিযুক্ত
২। কর্পোরাল এ,বি,এম আব্দুস সামাদ	৮নং অভিযুক্ত
৩। কর্নেল শওকত আলী	২৬নং অভিযুক্ত
৪। ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুল জলিল	২৯নং অভিযুক্ত
৫। মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী	৩০নং অভিযুক্ত
৬। ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ উদ্দীন আহমেদ	৩৪নং অভিযুক্ত
৭। কমান্ডার আব্দুর রউফ	৩৫নং অভিযুক্ত

৫। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার

১। আব্দুর রাজ্জাক, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ।

২। ফয়েজ আহমদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ছড়াকার ও তৎকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকার চীফ রিপোর্টার।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বালাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

প্রশ্ন ২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

প্রশ্ন ৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন?

প্রশ্ন ৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কি ?

প্রশ্ন ৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক কি ছিল এবং সেই নেটওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল?

প্রশ্ন ৬ : মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখমুজিব এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

প্রশ্ন ৭ : আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতের কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

প্রশ্ন ৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

প্রশ্ন ৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য :

(ক) পকিস্তান সরকারের বেসামরিক চাকুরীতে বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ১০ : শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য :

(ক) পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

(খ) সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃংখল বাহিনীর সদস্য হয়েও আপনি কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন ?

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৫নং অভিযুক্ত লীডিং সীম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং তার উত্তর

তাং ০৭-০৭-২০০৩ ইং

প্রশ্ন-১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বালাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : স্বাধীন পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত একটি উপনিবেশিক দেশ। বাঙালি জাতিকে তার স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

উত্তর : ১৯৬২ সাল থেকে নৌ বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চিন্তাভাবনা করেছিলাম।

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন?

উত্তর : সশস্ত্র পন্থায় স্বাধীন করার মূল পরিকল্পনাকারী সুলতান উদ্দিন আহমেদ (৪নং অভিযুক্ত) নূর মোহাম্মদ (৫নং অভিযুক্ত)। আমরাই দুইজন সর্বপ্রথম কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (পি,এন) এর নিকট সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার কথা বলি। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে কমান্ডার মোয়াজ্জেম সাহেব আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কি ?

উত্তর : ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিবকে 'লাকমো হাউজ' (করাচি) (হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের বাসা আখতার সুলেমান (সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের মেয়ে)) ওখান থেকে শেখ মুজিবকে অনুরোধ করে করাচির হাউজিং সোসাইটিতে সুলতানের ভগ্নিপতি কামাল উদ্দিন সাহেবের বাসায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আমরা ৫ জন মিলিত হই। (১) কমান্ডার মোয়াজ্জেম

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন ২) সুলতান উদ্দিন আহমেদ (৩) নূর মোহাম্মদ (৪) ট্যুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও (৫) লেঃ মোজাম্মেল হক (সাক্ষী নং ১) এই বৈঠকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের প্রস্তাব করি। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমার যা যা করার দরকার আমি তাই করব, আপনারা এগিয়ে যান। বাঙালি জাতিকে স্বাধীন সার্বভৌম করার লক্ষ্যে আমি সর্বশক্তি দিয়ে আপনাদেরকে সাহায্য করব ইনশা আল্লাহ।

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক কি ছিল এবং সেই নেটওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল?

উত্তর : এই সাংগঠনিক ওয়ার্কে আমি সুপ্রিম কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য। আমার কোড নেম "সবুজ"।

প্রশ্ন-৬ : মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখমুজিব এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য মামলার নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়েছে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য।

প্রশ্ন-৭ : আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতের কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

উত্তর : আমদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে এই পরিকল্পনার কোনভাবে যোগাযোগ ছিল না।

প্রশ্ন-৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

403581

উত্তর : আগরতলা মামলা চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানুষ যে বৈষম্যের শিকার হয়েছিল, মামলা চলাকালীন সময়ে বাঙালি জাতি উপলব্ধি করেছিল যে, আমাদের এই সশস্ত্র পরিকল্পনা সঠিক এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

প্রশ্ন-৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য :

(ক) পকিস্তান সরকারের বেসামরিক চাকুরীতে বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : প্রযোজ্য নহে।

প্রশ্ন-১০ : শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য :

(ক) পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

(খ) সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃংখল বাহিনীর সদস্য হয়েও আপনি কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর : (ক) নৌ বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় সব সময়ই পশ্চিমারা বাঙালিদের সাথে বিমাতাসুলভ/বৈষম্যমূলক আচরণ করত। আমি বাঙালি বিধায় আমাকে জাতীয় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

(খ) সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য হয়েও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর আচার-আচরণে প্রতিটি সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ ছিল।

বর্তমান ঠিকানা :
আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ বাবুল
১নং সড়ক গোয়ালচামট
শ্রী অঙ্গন, ফরিদপুর।

(আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ) (৫নং অভিযুক্ত)
পিতা-মরহুম আলহাজ্ব তমিজ উদ্দিন আকন
গ্রাম+ডাকঘর : কুমার ভোগ
থানা : লৌহজং
জেলা : মুন্সীগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলায় ৮নং অভিযুক্ত কর্পোরাল এ, বি, এম, আব্দুস সামাদ-এর কাছে প্রশ্ন ও তার উত্তর

তাং ০৫-০৫-২০০৩ ইং

প্রশ্ন-১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : পাকিস্তান নামক স্বাধীন দেশটি প্রতিষ্ঠার শুরুতেই নানা রকম প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। ১৯৪০ সালে এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে মুসলিম অধ্যুষিত অংশে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লেজিসলেটরদের কনভেনশনে States এর 'S' মুদ্রন বিভ্রাট আখ্যা দিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শুরু হল পূর্ব অংশের উপর কর্তৃত্ব এবং জিন্নাহ্ সাহেব নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নিজে গভর্ণর জেনারেল পদে আসীন হন এবং প্রধানমন্ত্রী পদ দেন লিয়াকত আলী খানকে। তাছাড়া, লিয়াকত আলী খানসহ ৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানিকে পূর্ব বাংলা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

পরের ঘটনা, বাংলা ভাষা ৫৬% পাকিস্তানের অধিবাসীর অর্থাৎ পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও জিন্নাহ্ লিয়াকত আলী খানদের ৩% লোকের ভাষা সত্ত্বেও উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা করা হয়। ফলে বরকত, সালাম, রফিক, শফিক অনেককে হত্যা করা হয় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রবল আন্দোলনরত অবস্থায় গুলি করে।

এ সকল ঘটনাসহ শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে স্বাধীন বাংলা গঠনের চিন্তা আসে।

প্রশ্ন-২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

উত্তর : বিমান বাহনীতে চাকুরীরত অবস্থায় বাঙালিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিবাদ ও সরকারের নজরে আনার প্রচেষ্টায় এ সময় জাতীয় সংসদে আলোচনা আনা হয় বৈষম্যের ব্যাপারে।

১৯৫৩ সালে রিসালপুর বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে একটি অনুন্ধান কমিটির সদস্যদের সামনে আমরা ৪০ জন বাঙালি সদস্য উপস্থিত হয়ে আমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচণের প্রতিকারসহ

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনীতে জনসংখ্যার অনুপাতে নিয়োগের দাবি জানাই। তখন থেকে ক্ষুদ্র বাঙালিদের ঘরোয়া আলোচনায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি।

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন?

উত্তর : ১৯৬৫ সালে ভারতের সাহিত যুদ্ধ চলাকালীন সময় আমি হায়দারাবাদের বেদীন ঘাটিতে যাবার প্রাক্কালে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় উপস্থিত হলে তিনি বাংলাদেশেকে স্বাধীন করার প্রস্তুতি সম্বন্ধে আমাকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন এবং আমাকে সম্পৃক্ত হতে বলেন।

(উল্লেখ্য লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন আমার স্কুল জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমাদের যোগাযোগ তখনও অটুট ছিল।)

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে কখোনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কি ?

উত্তর : বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে একদিন আমাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমি আমার নিজের কার্যক্রম ও সার্বিক কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত করলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক কি ছিল এবং সেই নেট-ওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল ?

উত্তর : আমি ৬নং অভিযুক্ত আহমেদ ফজলুর রহমান সাহেবের গ্রীণ ভিউ পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ নেয়ার পরে আমার কার্যক্রমের প্রধান অংশ ছিল বিভিন্ন ইউনিটের সহিত সমন্বয় সাধন করা।

প্রশ্ন-৬ : মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : মামলার সরকারি নাম রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য হলেও যেহেতু ভারতের আগরতলার একটি প্রতিনিধি দল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধির সহিত বৈঠক করেছিল তাই ভারত বিদ্বেষী মনোভাব জাগ্রত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য ফলাও করে আগরতলা মামলা নামকে প্রকাশ করতে থাকে। উক্ত প্রচার উল্টো সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়, যখন জনগণের কাছে প্রকাশ পেতে শুরু করে যে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যা ছিল অনিবার্য।

প্রশ্ন-৭ : আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতের কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

উত্তর : আমাদের সেনা, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীসহ তৎকালীন ই পি আর এবং পুলিশ বাহিনীর সম্পৃক্তি ও সমন্বিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকায়, আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

কুটনীতিকদের সহিত যোগাযোগ করার। আমার কর্মস্থল 'গ্রীণ ভিউ' পেট্রোল পাম্প থেকে মাসিক মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ পেট্রোল নিতেন। একদিন মিঃ জর্জ নামক একজন সেক্রেটারীকে আমি অফিসের ভিতরে ডেকে এনে কিছু গোপন কথা বলার ইচ্ছা প্রকশ করায় তিনি আমাকে ধানমন্ডিস্থ ৭নং রোডের বাস ভবনে বিকেল ৫ ঘটিকায় যাওয়ার জন্য সময় দেন। আমি সেখানে পৌছে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রয়াসের কথা জানিয়ে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন যে তাঁদের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ভারতের কি লাভ ? তখন আমি বলি পাকিস্তান নামক দেশে নির্যাতন ও বৈষম্য ভিত্তিক শাসনের ফলে আমরা দিন দিন দারিদ্র্যের দিকে চলে যাচ্ছি। স্বাধীনতা ছাড়া উন্নতির আশা করা যায় না। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য আমরা প্রস্তুত। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পাকিস্তানের অবস্থান এবং শত্রুভাবাপন্ন হওয়ায় ভারতের নিরাপত্তা উভয় দিকে হুমকির মধ্যে আছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে 'সাজেক' নামক স্থানে ট্রেনিং দিয়ে নাশকতামূলক কাজে ভারতের পূর্বাঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টি করে চলছে 'আ,এস,আই' নামক গোয়েন্দা সংস্থা। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আমরা উভয় বন্ধু রাষ্ট্র পরস্পরের উন্নয়নে সহযোগিতা করব এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাবে। মিঃ জর্জ এ কথার পরে আমার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেন, তাহলে তো আমাদের সহযোগিতা করা দরকার। ১ম সেক্রেটারী মিঃ ওঝা ছুটি শেষে ফিরলেই তার সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

পরের সপ্তাহে মিঃ ওঝার সহিত কমান্ডার মোয়াজ্জেম ও আমার সাক্ষাৎ হয় তদ্রধানমন্ডিস্থ ২নং রোডের বাড়িতে। সেখানে বিস্তারিত আলোচনার পর ছোট অস্ত্র সরবরাহ সহ স্বাধীনতা ঘোষণার দিন পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র বাহিনীর বিমান পথে বাংলাদেশে আসা বন্ধ করার কথা হয়। মিঃ ওঝা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতির কথা জানান। সেই অনুসারে পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে ১২ জুলাই ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে আমাদের প্রতিনিধি আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ছোট অস্ত্রের তালিকা নিয়ে আগরতলায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধির সহিত বৈঠকে মিলিত হন।

প্রশ্ন-৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষের মধ্য দিয়ে। ঐ মামলা চলাকালীন খবরের কাগজগুলি মামলার বিবরণী বিশেষ করে দৈনিক আজাদের সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের 'ট্রাইব্যুনাল কক্ষে' বিস্তারিত প্রকাশ করেন অভিযুক্তদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কার্যক্রম, যা-বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবকে মহানায়ক এবং বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলে শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত হন, মামলা প্রত্যাহারের পরের দিন সংবর্ধনা সভায়। সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সিংহভাগ আসন লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। (ক) প্রশ্ন : পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : আমি বিমান বাহিনীতে চাকুরীকালীন কোয়েটা ঘাটির সিগনাল ব্রাঞ্চে আমার ২ জন জুনিয়রকে আমাকে ডিঙ্গিয়ে কর্মকর্তা করা হলে আমি প্রতিবাদ করি এবং ২ মাসের মধ্যে রেকর্ড অফিস আমাকে প্রমোশন প্রদান করে যা ছিল আমার প্রাপ্য এবং ওদের বদলী করে অন্য স্থানে জুনিয়র হিসেবে।

(খ) প্রশ্ন : সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য হয়েও আপনি কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না, এই ধারণা থেকে পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২৬নং অভিযুক্ত কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী এম পি সাহেবের কাছে প্রশ্ন এবং তার উত্তর

তাং ১৫-০৯-২০০৩ ইং

ঢাকা।

প্রশ্ন-১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল ? সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হলেও সেদেশে বাঙালিদের অধিকার অস্বীকৃত ছিল । পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% বাঙালি হলেও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল ৪৪% পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। প্রথমে করাচি, পরে রাওয়ালপিন্ডি এবং তারও পরে ইসলামাবাদ। রাওয়ালপিন্ডির পার্শ্ববর্তী পাবর্ত্যভূমিতে ইসলামাবাদ নামক নতুন রাজধানী গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট থেকে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। পাকিস্তানের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল পাকিস্তানিদের রাজধানীকে কেন্দ্র করে এবং তার আশেপাশে। পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কল-কারখানা, সবকিছুর মালিকানা ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পকিস্তানিদের হাতে। পশ্চিম পাকিস্তানে বড় বড় শিল্প গড়ে উঠল। সেই তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির মূল উৎস 'কৃষি' অবহেলিত হতে লাগল। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় বাঁধের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা হতে লাগল। যে কারণে পশ্চিম পকিস্তানের অনুর্বর এলাকায়ও কৃষির উন্নতি হলো এবং কৃষি-উৎপাদন বাড়তে লাগলো। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়নে। সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল খুবই কম। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে বাঙালি চাকুরিজীবীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। সশস্ত্র বাহিনীতে এই চিত্র ছিল আরো করুণ, সেখানে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ৫% ভাগের বেশি ছিল না। পাকিস্তানে গণতন্ত্র অস্বীকৃত ছিল। যতটুকু গণতন্ত্রের চর্চা হতো তাও আইউব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী করে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এক কথায় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বাঙালিদের অধিকার অস্বীকৃত ছিল এবং বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কোন সুযোগ ছিল না। সে কারণেই বাঙালিদের জন্য বাংলাদেশ নামক একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা আমি করেছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

উত্তর : ছাত্র জীবন থেকেই ভাবতাম যে, পাকিস্তান একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল দ্বি-জাতিতত্ত্ব। অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য ভারত এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল এবং ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দুইভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান হলো, তখন দেখা গেল যে, পাকিস্তানের সকলেই মুসলমান নয়। কমপক্ষে এক কোটি অন্য ধর্মের মানুষ বিশেষ করে হিন্দু পাকিস্তানে থেকে গেল। আর ভারতে কয়েক কোটি মুসলমান বসবাস করতে লাগলো। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই দ্বিজাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ পাকিস্তানের অধিবাসীরা শুধু মুসলমান ছিল না। অপরদিকে ভারতেও শুধু হিন্দুরা ছিল না। উভয় দেশেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করতে থাকলো। কোন্ ধর্মের লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি ছাত্র জীবন থেকে অর্থাৎ সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আরো ভাবতাম যে, বাঙালিদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের চেয়ে একবারেই আলাদা। এছাড়া রাজনৈতিকভাবে বাঙালিরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা শাসিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে হচ্ছিল শোষিত। কাজেই পাকিস্তানের দুই অংশ একরাষ্ট্রে অবস্থান করা একেবারেই অবাস্তব ছিল এবং সে কারণেই আমি ভাবতাম পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া উচিৎ। ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথেও আমার এ চিন্তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন?

উত্তর : ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হিসাবে কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলাম। তখন আমার বন্ধু আর্মি মেডিক্যাল কোরের ক্যাপ্টেন ডাঃ শামসুল আলম এর মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে একদল দেশপ্রেমিক বাঙালি বিপ্লবী যোদ্ধা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সশস্ত্র পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছেন। আমি সাথে সাথে এই দেশপ্রেমিকদের সাথে নিজেকে যুক্ত করি।

প্রশ্ন-৪: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কি ?

উত্তর : বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার সরাসরি কখনও যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু আমি জানতাম যে, বঙ্গবন্ধু এই পরিকল্পনার মূল রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। আর লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন সামরিক সমন্বয়কারী। আমি এও মনে করতাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন বিরাজমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার একমাত্র পথ ছিল সশস্ত্র বিপ্লব। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু আমাদের সশস্ত্র পরিকল্পানায় সম্মতি দিয়েছিলেন। আবার জনগণকে ঐতিহাসিক ৬ দফার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচী ও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু লাহোরে তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। ৬ দফা দ্রুত বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙালিদের একচ্ছত্র নেতা।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচী ও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু লাহোরে তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। ৬ দফা দ্রুত বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙালিদের একচ্ছত্র নেতা।

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক কি ছিল এবং সেই নেট-ওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল ?

উত্তর : আমরা ধীরে ধীরে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ধারণা খুব গোপনীয়তার সাথে প্রচার করেছিলাম। প্রায় সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করে এবং সশস্ত্র বিপ্লবকে স্বাধীনতার একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করে। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত বাঙালিরা ছাড়াও আমরা সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন বাঙালি সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ করি। আমাদের এই প্রক্রিয়ায় কিছু বেসামরিক বাঙালিও যুক্ত হয়। আমাদের মূল পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাঙালিরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো ক্যান্টনমেন্টে একসাথে, একই সময়ে আক্রমণ পরিচালনা করে ঘুমন্ত অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দী করব এবং সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব। আমাদের নেটওয়ার্ক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব ক্যান্টমেন্টে ছড়িয়ে ছিল এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের আমরা পারিকল্পিতভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বদলী করে আনার প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলাম। এই নেটওয়ার্কে আমার অবস্থান ছিল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে। আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব বাঙালি অফিসার এবং তাদের মাধ্যমে তাদের অধীনস্থ বাঙালি সেনাদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ধারণা গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-৬: মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : মামলার সরকারি নামকরণ হয়েছিল মামলা শুরু হওয়ার সময়ে। অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন যেদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্য শুরু হয় সেদিন আমরা জানতে পারলাম যে, মামলার সরকারি নামকরণ করা হয়েছে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য"। কিন্তু এর আগে থেকেই এই মামলার নাম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে রাষ্ট্রীয় প্রচার যন্ত্রে প্রচারিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা নামটি যুক্ত করলে জনগণকে সহজেই অভিযুক্ত বাঙালিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে। আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগনামা ট্রাইব্যুনালে পেশ এবং পাঠ করা হয় তাতে আগরতলা সম্পর্কে ছোট কয়েক লাইনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, আমাদের দুইজন বিপ্লবী সহকর্মী ভারতীয় সেনা-কর্মকর্তাদের সঙ্গে অস্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করতে আগরতলা গিয়েছিল। কিন্তু সে আলোচনার ফলে কোন অস্ত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছিল

Dhaka University Institutional Repository

বলে সরকার কোন অভিযোগ বা প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেনি। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে বিপ্লবীরা আগরতলা গিয়েছিল কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে কোন অস্ত্র আমাদের হাতে আসেনি। তাছাড়া আগরতলা যাওয়ার ঘটনা সমস্ত অভিযোগনামাটিতে খুবই গুরুত্বহীন ছিল। কারণ সরকার অভিযোগনামায় উল্লেখ করেছে ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। কয়েকবার তারা এই অভিযোগ তাদের অভিযোগ নামায় উল্লেখ করেছে। তাছাড়া বিপ্লবীদের বিভিন্ন বৈঠক যা অভিযোগ নামায় উল্লেখ করা হয়েছে সেই বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে করাচি, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে। অভিযোগ নামায় ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগের ঘটনা ঢাকায় হয়েছে বলে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে মামলার নামের পূর্বে আগরতলা শব্দটি ব্যবহার করা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যদিও আমাদের বিদ্রোহের পারিকল্পনা সঠিক ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র শব্দটিতে আমার ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। কারণ আমরা কোন ষড়যন্ত্র করিনি। আমরা বাংলাদশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম যা ছিল একটি দেশপ্রেমিক পদক্ষেপ। পাকিস্তানিরা যেমন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের দুস্কৃতকারী বলেছিল, একইভাবে এই মামলার অভিযুক্তদের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে পাকিস্তানিরা আখ্যায়িত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে আমরা ছিলাম দেশপ্রেমিক বাঙালি।

প্রশ্ন-৭ : আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতীয় কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

উত্তর : আমার সাথে সরাসরি ভারতীয়দের যোগযোগ হয়নি বা ছিল না। কারো যোগাযোগ ছিল বলেও আমার জানা নেই। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারত সকল প্রকার সাহায্য করবে এটা আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। এজন্য যে, ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল, যা এখনও আছে এবং ভারত অবশ্যই চাইবে পাকিস্তানকে দূর্বল করতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ভারতের বিশাল সশস্ত্র বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চতুর্দিকে রাখার আর প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের একটি স্বাভাবিক দূর্বলতা ছিল। যে কারণে তারা ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করেনি। যদিও তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রকৃতপক্ষেই অরক্ষিত।

প্রশ্ন-৮: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে উপমহাদেশে দুইটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যথা- ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান এবং পূর্বাঞ্চলের পূর্ব বাংলা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে সাধারণভাবে পশ্চিম পাকিস্তান বলা হতো এবং পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব বাংলাকে সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানের মোট

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যার ৫৬% ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছিল ৪৪% জন। কিন্তু পাকিস্তানের সৃষ্টির পর থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা অনেক বাড়তি সুবিধা ভোগ করতো। তাছাড়া দুই পাকিস্তানের মাঝখানে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার ভারতীয় ভূ-খন্ড অবস্থিত ছিল। পাকিস্তানের দুই অংশ প্রাকৃতিক ভাবে ভারতীয় ভূ-খন্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। পূর্ব বাংলার অধিবাসী বাঙালিদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান বা বেলুচিদের সংস্কৃতিগত কোন মিল ছিল না, ভাষা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্মের দিক দিয়ে কিছুটা মিল থাকলেও ধর্মের দর্শন, অনুশীলন, রীতিনীতি, আচার-প্রকৃতি সবকিছুই ভিন্ন ছিল। বাঙালিরা ছিল চরিত্রগতভাবে, অসাম্প্রদায়িক এবং পরধর্মসহিষ্ণু। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ধর্মপালনের ক্ষেত্রে বাঙালিদের চেয়ে কম ধার্মিক ছিল। কিন্তু ধর্মীয় আচরণে বা কথা-বার্তায় তারা ছিল কট্টর সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এতসব জেনেও পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিল ১৯৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রভূসুলভ আচরণ, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তানের অর্থনীতি করায়ত্ত করণের ফলে বাঙালিদের মনে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য পাশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে বাঙালিরা শোষিত হতে থাকে। রাজনৈতিক ভাবে হতে থাকে শাসিত। তছাড়া বাঙালির সংস্কৃতির উপরে পাকিস্তানিদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাঙালিদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে বাঙালিদের উপর। পাকিস্তানিরা জোর করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মাতৃভাষা "বাংলাকে" পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা মেনে নিতে চায়নি। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৫২ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করে পাঁচজন বাঙালিকে হত্যা করা হয়। যথা : শহীদ, বরকত, সালাম, রফিক, সফিক এবং জব্বার। বাঙালিরা এ ঘটনায় দারুণভাবে হোঁচট খায় এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থান সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। তারা ভাবতে শুরু করে যে, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বাঙালিরা পুনরায় পরাধীন হয়ে গেছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য ছিল পর্বতপ্রমাণ। কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক চাকুরীতে শতকরা ১০ জনও বাঙালি ছিল না। সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা শতকরা ৫ জনের বেশি ছিল না। সবকিছু মিলে বাঙালিদের মনে স্বাধীনতার চিন্তা শুরু হতে থাকে।

১৯৫৮ সালে আইউব খানের সামরিক শাসন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে আরো বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আইউব খানের শাসনের এক দশক প্রকৃতপক্ষে বাঙালিদের পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের উপর দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। আইউব খানের শাসনামলেই ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথে ভারতের ১৭ দিনের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের সময় বাঙালিরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কারণ তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রকৃতপক্ষেই অরক্ষিত।

Dhaka University Institutional Repository

খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর অধীনেই ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। যদিও জনগণের রায় ৬ দফার প্রশ্নে ম্যান্ডেট ছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল স্বাধীনতার পক্ষের রায়। জনগণের রায় পাকিস্তানিরা মানতে রাজী হয়নি এবং বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতাও হস্তান্তর করেনি। যার ফলে অনিবার্য হয়ে ওঠে মহান মুক্তিযুদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই বঙ্গবন্ধুকে বাঙালিদের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জনগণ রায় দিয়েছে। আর ৭০ এর নির্বাচনে রায়ের অবধারিত পরিণতি ছিল ৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

প্রশ্ন ৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য :

(ক) পাকিস্তান সরকারের বেসামরিক চাকুরীতে বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ১০ : শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য :

(ক) পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : (ক) বাঙালীদের পাকিস্তানীরা বলত "নন–মার্শাল রেইস" অর্থাৎ অসামরিক জাতি। আর পাকিস্তানীরা নিজেদের দাবী করত সামরিক জাতি হিসেবে। কিন্তু মার্শাল আইউব তার কুখ্যাত "ফ্রেন্ডস নট মাষ্টার্স" বইতে বাঙালীদের একটি অধপতিত জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে বাঙালীরা ভাল মুসলমান বা ভাল মানুষ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের মুখে প্রায়ই শুনতাম যে তারাই আমাদের তথাকথিত ভারতীয় আগ্রাসন থেকে রক্ষা করছে। সামরিক প্রশিক্ষণ বা যুদ্ধে বাঙালীরা ভাল নৈপুণ্য দেখালেও পাকিস্তানীরা কখনো প্রশংসা করতনা। বরং তারা বাঙালীদের নিন্দা করেই চলত। খেলাধূলায়ও বাঙালীদের নৈপুণ্যকে তারা ছোট করে দেখত। একবার করাচীর সন্নিকটে মালির ক্যান্টনমেন্টে অর্ডন্যান্স সেন্টার অফিসার্স মেসে আমরা দুজন বাঙালী অফিসার কন্ট্রাক্ট ব্রিজ টুরনামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। বলা হলো যে, ব্রিজ টুরনামেন্টটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়নি। অথচ প্রকৃত কারণ ছিল, আমরা দুইজন পার্টনার ছিলাম এবং পরাজিত দুইজন পার্টনার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। এসব ছাড়াও বাঙালী সৈনিকদের নানাভাবে নির্যাতন করা হতো। উন্নত প্রশিক্ষণ, বিদেশে প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ইত্যাদি থেকে বাঙালীদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হতো।

(খ) সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃংখল বাহিনীর সদস্য হয়েও আপনি কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : (খ) সশস্ত্র বাহিনীর শৃংখলা রক্ষা করা যেমন একজন সৈনিকের কর্তব্য। দেশকে ভালবাসা একজন সৈনিকের তার চেয়েও বড় কর্তব্য। আমরা যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে "পাকিস্তান" আমাদের দেশ নয়। বরং পাকিস্তানের নাম করে আমাদের দেশ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা এবং পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে তখন সৈনিক হিসেবে আমাদের আনুগত্য আর পাকিস্তান নামক দেশের প্রতি অটুট ছিলনা। ধীরে ধীরে আমাদের আনুগত্য পরিবর্তন হয়ে তা পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের দিকে ঝুকে পড়ে। তাই সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালীরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই তাদের প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলায় ২৯নং অভিযুক্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট আবুল জলিল এর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর

তাং ২১-০৬-২০০৩ ইং

প্রশ্ন-১: পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : পাকিস্তান একটি স্বাধীন দেশ ছিল সত্য হলেও সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পাঞ্জাবী আমলাদের হাতে। বাঙালিদের মনে করা হতো ২য় শ্রেণীর নাগরিকের মতো। পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নই ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য।

প্রশ্ন-২: বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

উত্তর : পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতেই সমগ্র বাংলাদেশ, আসাম ও ত্রিপুরাকে নিয়ে একটি স্বাধীন "বঙ্গাসাম" স্টেট আন্দোলনের সমর্থক ছিলাম।

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত ছিলেন ?

উত্তর : মরহুম ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লার মারফৎ লেঃ কঃ শহীদ মোয়াজ্জেম হোসেন পরিচালিত সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার আন্দোলনে জড়িত হই।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কি ?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু যখন করাচি যেতেন তখনই তার সাথে যোগাযোগ করতাম এবং বাঙালিদের উপর সশস্ত্র বাহিনীতে অন্যায় অবিচারের কথা তাঁর কাছে তুলে ধরলে তিনি স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে এসবের প্রতিকার না হলে অগত্যা চূড়ান্ত ভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের সবকিছু আদায় করে নিতে হবে বলে আমদের আশ্বাস দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক কি ছিল এবং সেই নেট-ওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল ?

উত্তর : এই সশস্ত্র আন্দোলনের ১ নম্বর ব্যক্তি ছিলেন শহীদ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। এর পরে আমি স্থান দেই মরহুম ফ্লাঃ সাঃ মফিজুল্লাহ ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরকে যুগ্ম ভাবে এবং আমার স্থান ছিল তাদের পরে।

প্রশ্ন-৬: মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : সরকারি নাম-রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নামটিকে সরকারি প্রচার মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে পাকিস্তান সরকারই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত করায়। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল যেন বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ঢাকার রাজপথে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং স্লোগান দেয় যে এরা পাকিস্তান ভেঙ্গে দিতে চায় অর্থাৎ এই মামলার আসামীরা রাষ্ট্রদ্রোহী, ভারতের সাহায্যে এরা পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দিতে চায়। এদের ফাঁসি দেওয়া হোক। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টো অর্থাৎ এ মামলার মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার লোকেরা স্বাধীনতার চেতনাকে জাতীয় ভাবে গ্রহণ করে এবং আন্দোলন করে আমাদের মুক্ত করে বীরের মর্যাদা দিতে থকে।

প্রশ্ন-৭: আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতের কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

উত্তর : ভারতের সম্পৃক্ততা এতটুকুই ছিল যে, ১৯৬৭ সনের ১২ ই জুলাই রাত ১১ টায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিনিধির সাথে আমদের প্রতিনিধি জনাব আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের একটি মিটিং হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত এ আন্দোলনে কতটুকু সাহায্য করতে পারে তা অনুধাবন করা এবং ভারতের উদ্দেশ্য ছিল আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস এবং আমাদের নেতৃত্ব কোন পর্যায়ের লোক তা যাচাই করা। আমার মনে হয় আমাদের নেতাদের সম্বন্ধে প্রতিনিধিরা খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি।

প্রশ্ন-৮: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

উত্তর : আগরতলা মামলার আগে ও অনেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছেন এবং ঘরোয়া ভাবে আলোচনায় স্বাধীনতার কথা বলেছেন কিন্তু বাঙালি জাতি সমষ্টিগত ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাকে গ্রহণ করে এই মামলার মধ্য দিয়েই।

প্রশ্ন-৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য।

উত্তর ঃ প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন-১০ : (ক) পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর : পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ২য় শ্রেণীর নাগরিকের মত ব্যবহার করতো। আমাদের ডাইনিং হলে রেডিওতে কখনও আমরা ঢাকা রেডিও বা কলকাতা রেডিও টিউন করতে পারতাম না। হয়তো করাচি রেডিও অথবা রেডিও সিলোন ধরা হতো। করাচি রেডিওতে সারাদিন উর্দু প্রোগ্রাম থাকতো। তবে সকাল ১০ টার দিকে কোনদিন ১টি অথবা কোনদিন ২টি বাংলা গান দেওয়া হতো। ঐ সময় এলেই তারা রেডিও অন্য স্টেশনে টিউন করতো। এ ব্যাপারে ওদের সাথে অনেক সময় তর্কাতর্কি ও মাঝে মধ্যে হাতাহাতিও হতো।

প্রশ্ন : (খ) সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য হয়েও আপনি কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : আমার মনে হয়েছিল বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আমাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন এবং সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত বাঙালিরা এগিয়ে না এলে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা তা কখনো সম্ভব হতো না।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলায় ৩০নং অভিযুক্ত মাহবুব উদ্দিন চৌধুরীর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর

তাং ০৪-০৬-২০০৩ ইং

প্রশ্ন-১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : দ্বি-জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিজেই পাকিস্তানের প্রথম গণ পরিষদের সভায় বলেছিলেন, "আজ হতে কেউ হিন্দু কিংবা মুসলমান নয় সকলেই পাকিস্তানি।" তাঁর এই উক্তির মধ্য দিয়েই দ্বি-জাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় আমি মাত্র পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম; তবু হাটে বাজারে গণসঙ্গীতে অংশ নিয়ে, লোক সমাগম করে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলাম। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অর্থাৎ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে পাকিস্তানি শাসকদের অনীহা এবং ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে জনগণের রায়কে অবমাননা করবার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর আসল মনোভাব, আর তখন থেকেই পাকিস্তানের অখন্ডতা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন-২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

উত্তর : ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার করুণ চিত্র প্রকাশ পায়। ১৯৬৬ সালে আমি আমার কার্য-প্রতিষ্ঠান জে.এন্ড.পি কোট্স্ পাকিস্তান লিঃ এর পক্ষ হতে হল্যান্ডে প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম। ঐ প্রতিষ্ঠানটি একটি পাক-বৃটিশ মালিকানা কোম্পানী ছিল। হল্যান্ড দেশটি সমুদ্র সীমার নিচে অবস্থিত কিন্তু ঐ দেশের জনগণ ও সরকার যেভাবে দেশটিকে বাঁধের মাধ্যমে সমুদ্রের গ্রাস হতে রক্ষা করে জনগণের উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে তা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হই এবং প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার ক্ষতির চিত্র আমার মানসপটে ভাসতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানকে বন্যার গ্রাস হতে রক্ষা করবার জন্য পাকিস্তান সরকার কার্যকর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু নদীর বাঁধ, গোলাম মোহাম্মদ বেরেজ, ওয়ারসো প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করে মরুভূমিকে কৃষি উপযোগী করে তোলে। এতে আমার মন পাকিস্তানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং আমি মনে করি যে পাকিস্তান সরকার আমাদের প্রতি কোনদিন সুবিচার করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : হল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর আমার প্রয়াত বন্ধু সিরাজুল ইসলাম যিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি আমাকে জানালেন যে পাকিস্তানিদের অবিচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কিছু লোক চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করা হবে। আমি তাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলাম। গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিন আগে নৌবাহিনীর লেঃ রউফ বিমানবাহিনীর সিরাজুল ইসলাম ও আমি ছুটিতে পূর্ব পকিস্তানে ব্যবসায়ের ছত্র-ছায়ায় আমাদের বিপ্লবী কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে এসেছিলাম। ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ আমি করাচি ফিরে যাই ও ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৬৮ ইং গ্রেপ্তার হই।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো ?

উত্তর : (ক) ১৯৫৭ সালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী যশোরের আব্দুল খালেক সাহেব পূর্ত ও শ্রম মন্ত্রী, ফেব্রুয়ারি মাসে পি.ডাব্লিউ.ডি. তে আমার চাকুরি হয় একাউন্টস ক্লার্ক হিসাবে। জুলাই/আগস্ট মাসে ছাঁটাই এর নোটিশ দেখা যায়। ছাঁটাইয়ের তালিকায় শতকরা প্রায় ৮৫ জন বাঙালি। আমরা পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছে এই চিত্র তুলে ধরি। প্রায় সকলেই আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। যখন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এ বিষয়ে কথা বলি তখন তিনি বলে ওঠেন "এবার ঢাকায় গিয়েই সিসেশন ডিক্লেয়ার করে দিব, ওদের সাথে থাকা যাবে না।"

(খ) ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ পূর্ব পাকিস্তানে আইউব খান থেকে কম ভোট পাওয়ায় আমরা প্রবাসী বাঙালিরা ছুটিতে আসা করপোরেল সিরাজুল ইসলামের কাছে দুই প্যাকেট কাল চুড়ি দিয়ে বলি যে এক প্যাকেট শেখ মুজিব ও অন্যটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নেতাদের প্রবাসীদের পক্ষ থেকে উপহার। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে মিস জিন্নাহ্‌র কম ভোট পাওয়া। কিছুদিন পর শেখ মুজিব করাচিতে "লাখম হাউজে" হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বাসভবনে আসেন। করপোরেল সিরাজ এবং আমি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখি করাচি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মনজুরুল হক তার পাশে বসা। আমাদের দেখার পর তিনি সৈয়দ মনজুরুল হককে বলেন, "মনজুর আইয়ুব খান তো তোমাদের আরব সাগরে ভাসিয়ে দেবে বলেছে, আমার জায়গা ছোট হলেও আমি তোমাদের বাংলার মাটিতে স্থান দিব।" উল্লেখ্য যে নির্বাচনের সময় মুহাজিররা মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে কাজ করায় আইউব খাঁ রাগ করে বলে ছিলেন মুহাজিরদের আরব সাগরে ভাসিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক কি ছিল এবং নেট-ওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল?

উত্তর : আমার জানা মতে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিজীবী প্রায় ৮০ জনের ধারণা ছিল যে আমরা একত্রে থাকতে পারব না। যতটুকু জানি মেজর জেনারেল খাজা ওয়াজিউদ্দিন, কর্ণেল

Dhaka University Institutional Repository

ওসমানীসহ অনেক সামরিক কর্মকর্তা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম যিনি আইউব মন্ত্রীসভার আইন মন্ত্রী হয়েও আইউব খানের দেওয়া সংবিধানে স্বাক্ষর করেন নি।

প্রশ্ন-৬ : মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : মামলার নথি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে মোহাম্মদ আলি রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান আগরতলায় গিয়েছিলেন অস্ত্র নিয়ে আলোচনার জন্য। এছাড়া ১৯৪৮ সাল থেকে সিলেটের এক ব্যবসায়ী জনাব শরফ উদ্দিন চৌধুরী, মোয়াজ্জেম আহমেদ চৌধুরী এবং এই মামলায় অভিযুক্ত জনাব রুহুল কুদ্দুস বাংলার জন্য কাজ করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে মোয়াজ্জেম আহমেদ চৌধুরী একবার আগরতলায় পাঠিয়েছিলেন কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে যোগযোগ হয় নি। এইজন্যই আগরতলা নাম লাগানো হয় ; যাতে সাধারণ মানুষ আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়। ১ম দিকে পাকিস্তানিদের এ উদ্দেশ্য কিছুটা সফলতা পেলেও এবং আমাদের আত্মীয়-পরিজনরাও মামলার ১ম দিক দিয়ে আমাদের সাথে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করবার পর্যায়ে চলে গেলেও মামলা যতই অগ্রসর হয় এবং আমাদের আইনজীবীরা যখন ক্রমশঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার ও অন্যায় আচরণ প্রকাশ করতে থাকেন এবং এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান বুঝতে থাকেন তখন সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন-৭ : আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতের কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

উত্তর : উপরে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া আমার আর কিছু জানা নাই।

প্রশ্ন-৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা অপরিসীম। এই মামলা না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এত শীঘ্র অর্জিত হতো না। শেখ মুজিবুর রহমান এক প্রাদেশিক নেতা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেতা হতেন না। বঙ্গবন্ধু উপাধি পেতেন না, জাতির পিতাও হতেন না।

প্রশ্ন-৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য :

উত্তর : পাকিস্তানের সর্বস্তরের কর্তাব্যক্তিরা বাঙালিদের খুব নীচু মনে করতেন এবং প্রতিপদে হেনস্থা করবার চেষ্টা করতেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনদিন সত্য প্রকাশ করা হয় নি। মুহাজিরদের প্রায় সকলেই পূর্ব পাকিস্তানি হিসাবে সমুদয় ফায়দা ভোগ করতেন কিন্তু কার্যত সব বিষয়ে পশ্চিমাদের সহযোগিতা করতেন ও বাঙালির ক্ষতি সাধন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলায় ৩৪নং অভিযুক্ত ব্রিগেঃ খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর

তাং ০৩-০৫-২০০৩ ইং

প্রশ্ন-১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : পাকিস্তান স্বাধীন দেশ বটে কিন্তু পাকিস্তান একটা কলোনী ছিল এবং কোন রকমেই স্বাধীন ছিল না। কোন বাঙালি সে সময় কোন কথা বলতে পারত না। তার চিন্তা ধারাকে কেনা মূল্য দেওয়া হতো না। আমি পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম।

প্রশ্ন-২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আমার মনে জিন্নাহ্ এর রেসকোর্স ময়দানে ১৯৪৮ সালে শোনার পর থেকেই জন্মায়। যদিও ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলন এ আমি সক্রিয় অংশগ্রহণ করি কিন্তু তাহার পূর্বেই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫১ সালে যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে একটা উর্দু নাটক (নাজমা নুরী) ও উর্দুর অনুষ্ঠান করে। সেই অনুষ্ঠান আমরা বানচাল করেদেই এবং মেডিক্যাল কলেজের লেকচার গ্যালারীর ক্ষতি সাধন হয় এবং অবাঙালি ঘেঁষা ডাঃ টি আহমদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা সমস্ত ঢাকা এবং বাংলাদেশে ছড়াইয়া পরে যাহাতে ২১-০২-১৯৫১ ইং তারিখে লোকজন আরো সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ না করে।

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আমি এপ্রিল ১৯৬০ হইতে যুক্ত হই। যদিও ১৯৪৯ সালে লালবাগ পুলিশ লাইনে বাঙালি সিপাহীরা অস্ত্র হাতে পাঞ্জাবী সেনা ও ইপি আর এর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয় যাহা আমি প্রত্যক্ষ করি, যেহেতু আমার বাড়ি লালবাগ কেল্লার গাঁ ঘেঁষা। ১৯৬০ সালে লেঃ মোয়াজ্জেম ও আমি একই জাহাজে এবং একই কামরায় থাকতাম, লেঃ মোয়াজ্জেম তাহার পরিকল্পনা আমাকে জানায় এবং আমি উদ্বুদ্ধ হই এবং তখন থেকে আমরা সমান অফিসার ও সিপাহীদের সাথে আলাপ করিতে থাকি

Dhaka University Institutional Repository

এবং লেঃ মোয়াজ্জেম নবগঠিত রাষ্ট্রের দর্শন গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা বিশদাকারে পুস্তক লিখেন।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো ?

উত্তর : বঙ্গবন্ধুর সাথে স্বাধীনতার পরিকল্পনা নিয়ে কোন আলাপ আমি করিতে পারি নাই। একজন সেনা অফিসার হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর সাথে দেখা করাত দূরের কথা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা কিংবা তাহার নাম মুখে আনাও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে গর্হিত ও বিপজ্জনক ছিল। ১৯৬২ সালে লেঃ মোয়াজ্জেম আমাকে অবহিত করে যে করাচিতে শেখ মুজিব রাজনৈতিক কাজে আসিতেছেন এবং লেঃ মোয়াজ্জেম সিআইডি, পাকিস্তানি স্পাইদের চক্ষু এড়িয়ে লেঃ মোজাম্মেল এর বাসায় দেখা করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের প্রণালী ও ধারা ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হন এবং জানান যে এই বিপ্লবের কথা তিনি বহুদিন ধরে চিন্তা করিতেছেন কিন্তু দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। তাহার রাজনৈতিক গুরু এবং তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যিনি পাকিস্তানকে কোন দিন ভাঙ্গার কথা চিন্তা করতে পারেন নাই। আরো মহান বাঙালি যেমন শেরেবাংলা, ভাসানী, পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত থাকিয়া শান্তিতে বসবাস করাই পছন্দ করিতেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেন।

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক কি ছিল এবং নেট-ওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল?

উত্তর : যদিও কোন নামকরণ করা হয় নাই এই নেটওয়ার্কের কিন্তু মনে হয় যে আমার অবস্থান উচ্চেই ছিল এবং যেহেতু লেঃ মোয়াজ্জেম নৌ-বাহিনীর সেজন্য সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজ আমার ছিল। ১৯৬৩ সালে অভিযুক্ত কর্নেল আলিম করাচিতে আমার কাছে আসে এবং লেঃ মোয়াজ্জেমের সাথে তাহার সঙ্গে আমি পরিচয় করাইয়া দেই।

প্রশ্ন-৬ : মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য নাম পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের দেওয়া যাহাতে করে শেখ মুজিবকে এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে প্রাণদন্ড দেওয়া যায়। আগরতলা ছিল আমাদের সংগঠনের একটা প্রধান জায়গা যেখান হইতে আমরা সমস্ত সাহায্য, অস্ত্রপাবার পরিকল্পনা ছিল। আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রাজনীতিকদের সাথে আগরতলায় দেখা করতে পারতাম। ১৯৬৭ এর জুন মাসে আমার আগরতলা ভ্রমণ করার জন্য আমি চুপিসারে করাচি হইতে ঢাকায় আসি কিন্তু আমি ৩ দিন দেরী করার জন্য আগরতলায় অগ্রগামী

Dhaka University Institutional Repository

দল চলিয়া যায় এবং তারা ভারতীয় বর্ডার পুলিশ ও রাজনৈতিকদের সাথে কথাবার্তা বলে এবং সাহায্য প্রর্থনা করে।

প্রশ্ন-৭ : আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতের কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

উত্তর : ভারত প্রথম হইতেই আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সাহায্য না করিলে কোন দেশ পরাধীনতা হইতে মুক্তি পায় না।

প্রশ্ন-৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

উত্তর : আগরতলা মামলা না হইলে দেশ যে স্বাধীন হইতে পারে বাঙালিদের সে সম্বন্ধে ধারণাই ছিল না। ১৯৬৮ সালে সমস্ত বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে কিছু সংখ্যক নির্ভীক সেনাবাহিনীর সদস্য, দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজেদের জীবন ত্যাগ করেছিল। আগরতলা মামলা না হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম হতোই না।

প্রশ্ন-৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য :

উত্তর : প্রযোজ্য নহে।

প্রশ্ন-১০ : শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্ত/কর্মচারীদের জন্য :

ক) পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : পাচক, স্টুয়ার্ট ও মেথর ছাড়া কোন বাঙালিকে পাকিস্তান নেভীতে ভর্তি করা হতো না। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে ঘৃণা, হিংসার উদ্রেক করত এবং এদের সিওদের অবাঙালি রাখা হইত এবং 21/C ও Comoaly commander অবাঙালি ছিল। ১৯৫৮ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে আমাদের এক সতীর্থ পাঞ্জাবী ললনা বিবাহ করার মনবাসনা ব্যক্ত করায় এক পাঞ্জাবী অফিসারের উক্তি "হীরামুন্ডির বেশ্যারাও তো বাঙালি বিবাহ করিবে না। কথায় কথায় বঙালিদের অসামরিক, বিদ্রোহী ও ট্রেটর" বলা হতো।

প্রশ্ন-(খ) সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃঙ্কল বহিনীর সদস্য হয়েও কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হতে আমি শুধু পরিকল্পনায় যুক্ত হই নাই। আমি অন্যান্য অফিসার ও জোয়ানদের উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। আমার ডি এম এস (নেভী) পাকিস্তানি বিশ্বাসী কমোডর গারদেজী আমার অভিযুক্ত হওয়ার পর বলেছিল যে "জানতাম খুরশীদ এই ধরনের একটা কাজ করবে"।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলায় ৩৫নং অভিযুক্ত কমান্ডার (অবঃ) আব্দুর রউফ -এর কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে লিখিত বক্তব্য

তাং ৩০-০১-২০০৩ ইং

প্রশ্ন-১ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল। সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : তৎকালীন বৃটিশভারতকে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করে পাকিস্তান নামে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম হলেও গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পাকিস্তানের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে কারো কারো মনে এই আশাবাদ জন্মেছিল যে পাকিস্তান হয়ত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠবে এবং সেখানে নতুনভাবাদর্শে একটি জাতি চেতনার সৃষ্টি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নাই। জিন্নাহর মৃত্যুর পর অচিরেই উত্তর ভারত থেকে আগত আমলা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের আমলা, ভুস্বামী ও রাজনেতিক নেতৃত্বের সম্মিলিত চক্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অশুভ লড়াইয়ে নেমে পড়ে। এই আবর্তে শুধু গণতন্ত্রই নয়, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতি নির্মাণের সম্ভাবনাও সমূলে তিরোহিত হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে না। প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর প্রকৃত প্রস্তাবে পাঞ্জাবী আমলা-ভুস্বামী ও রাজনীতিক চক্রই পাকিস্তানের সমুদয় রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং পূর্ববাংলার জনগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। তখন থেকেই পূর্বাবংলায় চলতে থাকে জাতিগত নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার অশুভ প্রচেষ্টা। ফলে পূর্ববাংলা পরিণত হয় আধা-সামন্তবাদী, আধাঔপনিবেশিক, জাতিগত নিপীড়ণের শিকার একটি হতভাগ্য জনপদে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করার লড়াই বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। পক্ষান্তরে, একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যে গড়ে উঠা বাঙালি জাতির স্বাধীন স্বকীয় সত্ত্বা নিয়ে মাথাতুলে দাঁড়িয়ে একটি সমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলারই পদক্ষেপ মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-২ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আপনি কখন থেকে করেছিলেন ?

উত্তর : কখন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা শুরু করি এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে একটি অস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে ছেলেবেলাতে ; পরে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন, ৯২-ক ধারা জারী--ইত্যাকার নানাবিধ রাজনৈতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আমার চেতনা ক্রমে শাণিত হয়ে উঠে।

আমার ছেলেবেলা থেকেই আমি চলমান রাজনীতির একজন মনোযোগী দর্শক ও ধৈর্য্যশীল শ্রোতা ছিলাম। স্বাধীন বাংলাদেশের ধারণা খুব অল্প বয়সেই আমার মাথায় চেপেছিলো। আর এর মূলে ছিলেন আমার এক চাচা।

আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। ভৈরব কে. বি. হাই স্কুলে পড়ি। আমার চাচা জিন্নাত আলী কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি তৎকালে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন সক্রিয় কর্মীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের জনাব এ. কে. এম. আহসান, পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের জনাব আব্দুর রহিম ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সংস্পর্শ ও তিনি পান। সম্ভবত এদের অনুপ্রেরণায় তিনি স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাবটির উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন।

আমার আব্বাও মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমদের বাড়িতে একটা লাইব্রেরি ছিল। ছিল যে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার মুক্ত পরিবেশ। রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হতো। জিন্নাত আলী চাচা প্রায়ই তর্কে অংশ নিতেন। সে সময় গোঁড়া মুসলিম লীগ সমর্থকদের সাথে স্বাধীন বাংলার পক্ষ নিয়ে তার জোরালো বাক-বিতন্ডা আমি উপভোগ করতাম। ১৯৪৬ সালে শরৎ বসু, সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ যে অখন্ড-স্বাধীন-বাংলার প্রস্তাব রেখেছিলেন, সেটা গ্রহণ না করা যে আমাদের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়েছে, আমার চাচার এ বক্তব্যটি আমি মনে মনে দারুণভাবে সমর্থন করতাম। আমার দৃষ্টিতে এ চাচাটিকে ব্যতিক্রম বলেই মনে হতো। আমি মন দিয়ে এসব কথাবার্তা শুনতাম।

কিশোর বয়সে পাঠ্যবইয়ে শিবাজীর স্বাধীনতা যুদ্ধ, খন্ড খন্ড সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা, ছোটখাট আন্দোলনের কথা আমি পড়েছি। সেই কিশোর বয়স থেকেই মনে হয়েছে বড় হয়ে আমি দেশের জন্য অবশ্যই কিছু করবো। এ ধরনের একটা অস্পষ্ট ধারণা ও প্রত্যয় নিয়ে আমি ক্রমে বেড়ে উঠেছি।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। এই আন্দোলনের যথার্থতা সম্পর্কে আমার কিশোর মনে কোনো সংশয় ছিল না। তাই কালবিলম্ব না করেই আমি ভৈরব স্কুলে-কলেজের ছাত্রদের সাথে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম। ঐ সময়ের একটা তিক্ত স্মৃতি অবশ্য এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়েছে। ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনের মিছিলের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন কিংবা সহানুভূতি

Dhaka University Institutional Repository

তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরূপতাই লক্ষ্য করা গিয়েছে। একদিন মিছিলকারী ছাত্রদের ওপর ভৈরব বাজারের এক কাগজ বিক্রেতা থু থু পর্যন্ত ছিটিয়ে দিয়েছিলো। আমার সান্ত্বনা খোঁজার উদ্দেশ্যে আমার আব্বার কাছে এসে উপস্থিত হলাম। মুসলিম লীগের রাজনীতি করলেও আব্বা বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি বাড়ির সামনে ঘাসের ওপর গাছের ছায়ায় আমাদেরকে হরিণ আর শিকারীর সেই বিখ্যাত গল্পটি বললেন, যেখানে একটা হরিণকে তাড়া করছে একটি বাঘ। এরই মধ্যে এলেন এক শিকারী। তিনি বাঘটিকে হত্যা করে হরিণটিকে খাঁচাবন্দী করলেন।

হরিণটি শিকারীর কাছ থেকে কি ধরনের আচরণ পাবে ? হয় বন্দী পোষ্য জীবন, নতুবা জবাই। ...বাঙালিদের অবস্থাও আবদ্ধ হরিণের মতো। সেদিন আব্বার কথা থেকে আমরা এটুকু বুঝে নিয়েছিলাম যে, পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালিদের অধিকার পদদলিত করতেই থাকবে। অন্যদিকে অধিকার প্রতিষ্ঠা আর মুক্তিলাভের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

১৯৫০ সালে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ভৈরবে। এর পর এই সাহসী তরুণ নেতার সাথে আমার অনেক দেখা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, এই তরুণ নেতার মন্ত্রিত্ব লাভ ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতায় রূপান্তর প্রভৃতি ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি সচেতনভাবে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইউব খান এবডোর (Elective Bodies Disqualification Order---EBDO) মাধ্যমে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে প্রায় সকল নেতার মস্তকই নত করে ফেলেন। রাজনৈতিক অধিকারহারা হয়ে যান অনেকেই। এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শেখ মুজিব। এবডো চ্যালেঞ্জ করে অনেকগুলো মামলায় সাহসের সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি জয়ী হন। তখন থেকে আমার কেবলই মনে হতো যে, এই আপসহীন নেতাই একদিন বাঙালির মুক্তির লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন।

প্রশ্ন-৩ : সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার সাথে আপনি কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : করাচির ড্রিগ রোডে অবস্থিত পি-এন-এস কারসায় নামক একটি নৌস্থাপনায় ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি থেকে আমি চাকুরীতে ছিলাম। সে সময়ে আরেকজন বাঙালি অফিসার লেঃ মতিউর রহমান ও আমি একসাথে চাকুরী করতাম। দুজনেরই ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স ছিল কাছাকাছি। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলম। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে নয়, পারিবারিক ভাবেও।

এক সময় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম লেঃ রহমান কেমন জানি আনমনা, চিন্তামগ্ন ও বিষন্ন হয়ে থাকেন। প্রাণবন্ত মানুষটির পক্ষে এটা একবারেই ব্যতিক্রম। একদিন তাই কৌতূহল

Dhaka University Institutional Repository

দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "কি হয়েছে রহমান সাহেব"? উত্তরে তিনি বিমর্ষ ভাবেই বললেন, "পেটে কথা রাখতে পারলে বলবো, পারবেন"? কিন্তু সরাসরি কিছু বললেন না। এমন ভাবে ভূমিকা করেই তিনি কয়েকদিন পার করে দিলেন। আমিও নাছোড়বান্দা। আঠার মতো লেগে থাকলাম। বেশ চাপাচাপির পর লেঃ রহমান খুব সংগোপনে বললেন, "পূর্ব পকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর। এক দফার দাবি উঠেছে। অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান আলাদা করতে চায়। করাচিতেও এর সপক্ষে কাজকর্ম চলছে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কিছু সামরিক বেসামরিক লোক ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে"। লেঃ রহমান আরো বললেন, "এ মুহূর্তে কারো নাম বলতে চাই না, তবে নিজেও এই আন্দোলনের সাথে জাড়িত হয়ে পড়েছি"। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে তিনি থামলেন, আমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। এমন একটা ব্যাপার সশস্ত্র বাহিনীতে ঘটছে, অথচ আমি এর কিছুই জানি না। আর এগুলো যে আমারও প্রাণের কথা। আমার আবেগ ও বিহ্বল দেখে রহমান সাহেবও চমকিত হলেন। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে রহমান সাহেবই আমাকে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার কথা বলছেন না কেন"? আমি বললাম, কথাগুলো তো শুনলাম একটু আত্মস্থ হয়ে নিই" আসলে কিছু বলার মতো মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিল না।

এই ঘটনার বেশ কিছু দিন পর আমরা উভয়ে আসল কাজে তৎপর হলাম। '৬৭ সালের মাঝামাঝিতে কোনো এক ছুটির দিনে আমার ছোট্ট ফিয়াটে বসে আমরা ২ জন বেরিয়ে পড়লাম। লেঃ রহমানই পথঘাট চিনিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। করাচির মার্টিন কোয়ার্টার্সে এলে তিনি আমাকে গাড়ি থামাতে বললেন। এখানে কিছু সরকারি বেসমারিক কোয়ার্টার ছিল। এতে বেশ কিছু বাঙালি বসবাস করতো। এটি মূলত গেজেটেড ব্যক্তিবর্গের বাসস্থান। সেখানকার কোনো এক কক্ষে একটা গোপন বৈঠক চলছিলো। প্রচুর লোকজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। প্রথমেই মতিউর রহমান উপস্থিত সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় দিলেন। বিমান বাহিনীর ৪/৫ জন এবং নৌবাহিনীর ৫/৭ জনকে দেখতে পেলাম। এদের সাথে আমার আগে পরিচয় ছিল না। অবশ্য কিছু পরিচিত লোকের উপস্থিতিও লক্ষ্য করলাম। একটি টেক্সটাইল মিলের প্রোডাকশন ম্যানেজার জনাব মাহবুব উদ্দিন চৌধুরীকে দেখলাম। ভদ্রলোকের বাড়ি সিলেট। এছাড়াও লিডিং সীম্যান সুলতান আহমদ, বিমান বাহিনীর কর্পোরাল সিরাজ, ফ্লাইট সার্জেন্ট জলিল এতে উপস্থিত ছিলেন। এরা পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হন। বলা যায় এভাবেই সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনায় আমি যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো ?

উত্তর : আগরতলা মামলায় আটক থাকাকালীন সময়ের পূর্বে এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে আমার কোন আলাপ-আলোচনা হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-৫ : আপনাদের সাংগঠনিক নেট-ওয়ার্ক কি ছিল এবং নেট-ওয়ার্কে আপনার অবস্থান কি ছিল?

উত্তর : লেঃ রহমান এবং করাচিতে সংগঠিত গ্রুপটির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সে সময়ে আমি স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের অনেক তথ্য এবং ইতিহাসও জানতে পারি। রহমান সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম, ৬২-এর দিকে করাচির মনোরা দ্বীপের হিমালয়াতে বাঙালিদের একটা ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ছিল। বাঙালি নাবিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই সংগঠনের জন্ম। এর নেতা ছিলেন লিডিং সীম্যান সুলতান। তার সাথে আরো জড়িত ছিল স্টুয়ার্ট মুজিব, সীম্যান, নূর মোহাম্মদ প্রমুখ। সে সময়ে অফিসারদের বিরুদ্ধে সীম্যানদের যে সমস্ত ভয়ানক অভিযোগও ক্ষোভ ছিল, সেই ক্ষোভই এ ধরনের এ্যাসোসিয়েশনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি নৌবাহিনীর অফিসার ও নাবিকদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য গড়ে তোলে যা পাকিস্তান আমলেও অব্যাহত ছিল। এর ফলে অফিসারদের কাছে নাবিকরা মনুষ্যসুলভ ব্যবহার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতো। ব্রিটিশ আমলে অফিসারদের বড় অংশ ছিল ইংরেজ। আর পকিস্তানি জামানায় এদের বেশিরভাগই হলো অবাঙালি। স্বাভাবিকভাবেই অফিসার বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত জাতিগত বিদ্বেষের রূপ নেয়।

এই সংগঠনের সংগঠকরা যাদের আপন বলে মনে করেন তাদেরকেই এর সদস্য করে নিয়েছে। যেহেতু তখন বাঙালি অবাঙালি বিভাজন সামনে আসে তাই বাঙালি অফিসাররাও নাবিকদের আপনজন হয়ে যায়। এভাবে কিছু অফিসারও এই সংগঠনের সদস্য হয়ে পড়ে। লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল ছিলেন এর একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি ক্যাটারিং ব্রাঞ্চের নিম্ন পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে সাব-লেফটেন্যান্ট হয়েছিলেন। সীম্যানরা তাকে নিজেদের আপনজন বলে মনে করতো। এই ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ৬ দফার সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। নাবিকদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন এমন কিছু অফিসার যেমন লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম, লেঃ শাসছুল আলম চৌধুরী এক পর্যায় এ আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। লেঃ মোয়াজ্জেম ইঞ্জিনিয়ার ব্রাঞ্চের লোক, করাচির টেকনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট পি.এন.এস. কারসাযে কর্মরত থাকার সময় লেঃ রহমানের সাথে তার পরিচয় হয়। এভাবেই লেঃ রহমান এ আন্দোলনে একাত্ম হন। আর এভাবেই যে সংগঠন গড়ে উঠেছিলো নাবিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তা শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাবিত হলো। শুধু নৌবাহিনী নয়, সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য শাখার বাঙালি বেশ কিছু সদস্যও কালক্রমে এই সংগঠন ও আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে নয়, পূর্ব বাংলায়ও ক্রমান্বয়ে এই কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়েছিলো।

৬৬-র দিকে লেঃ মোয়াজ্জেম পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে আইডব্লিউটি-তে ডেপুটেশনে চলে আসেন। স্টুয়ার্ড মুজিব পালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের কর্মীদের

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকলাপ সম্পর্কে যতদূর জেনেছি তাতে করে এই আন্দোলনের কর্মীদের সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আমার মধ্যে গড়ে উঠলো। আমার মনে হলো, এদের সবার মনে প্রচন্ড ব্যথা আছে, তবে এদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নেই। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার ক্ষমতা নেই। আছে কেবল আবেগ আর উচ্ছ্বাস। আমি যেহেতু স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের শেষ রাতের নায়ক, অনেক তত্ত্ব, তথ্য জানতে হয়। আমি হাজারো প্রশ্ন করি, নিজেকেই নিজে জেরা করি পরে সিদ্ধান্তে পৌঁছি। তাই খুঁটিনাটি সব তথ্যই আমার কাজের জন্য মূল্যবান। এইসব কারণে আমি নবাগত হলেও আন্দোলনরত কর্মীদের কাছে গুরুত্ব পেতে থাকলাম। এরই মধ্যে আমি অনেকের কাছে, এমনকি রহমান সাহেবের দৃষ্টিতেও করাচিতে স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের সাথে যুক্ত চক্রটির নেতা বনে গেলাম।

রহমান সাহেবের কাছ থেকে তখন জানতে পারলাম যে, মোয়াজ্জেম সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই আন্দোলনের কাজ আনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তিনি ১৬ জন এস পি ও ১৩ জন ডিসি-র সাথে যোগাযোগ করেছেন, যারা সবাই এ আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থক হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে যোগযোগ করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন। রহমান সাহেব আরো জানালেন, ইতিমধ্যে কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছেন মোয়াজ্জেম সাহেব। তবে সেনাবাহিনীর অংশটির সাথে তখন পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়নি বলে পুরো কর্মসূচি বাস্তাবায়িত হচ্ছে না।

সে সময় অতীত কজের আরও একটি নতুন তথ্য পেলাম। ৬২-৬৩ র দিকে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বেও বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু বাঙালি অফিসার স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন সে আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলী, ক্যাপ্টেন মঞ্জুর, মেজর শামসুল আলম, মেজর খুরশীদ উদ্দীন, ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানসহ আরো অনেকে। তবে তারা বাঙালি সৈনিকদের শক্তি ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে শ্রেয় মনে করেন। কারণ কম সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ করার অর্থই হলো পশ্চিমাদের দ্বারা পিষ্ট হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, জয়লাভ তো দূরের কথা। কর্নেল ওসমানী মনে করতেন যে, দশটি বাঙালি রেজিমেন্ট গঠিত হওয়া ছাড়া বিদ্রোহ সফল হবে না। তাই বিলম্ব করার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রশ্ন-৬ : মামলার সরকারি নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য। কিন্তু এর নামকরণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিভাবে হলো এবং এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : তৎকালীন সরকারের নির্দেশেই পত্রপত্রিকায় মামলাটিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে চালিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নামটি সাধারণ মানুষের কাছে সেভাবেই পরিচিতি লাভ করে। এরকম নামকরণে সরকারের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এটাই প্রতিভাত করা যে ভারতীয় অনুপ্রেরণায় ভারতের আগরতলা শহরে বসে শলাপরামর্শ করেই আমরা একটি ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলাম যাতে সাধের পাকিস্তান ধ্বংস হবে এবং ভারতেরই লাভ হবে ; আমরা ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

এজেন্ট মাত্র এবং আমদের কর্মকান্ডে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালির কোন সুবিধা হবে না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে জাতিগত শোষণ ও নির্যাতনের শিকার বাঙালিদেরকে তারা ধোঁকা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলো। আমাদের বিরুদ্ধে মামলাটি বরং সকলকে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে দুঃসাহসী ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রশ্ন-৭: আপনাদের সশস্ত্র পরিকল্পনার সাথে ভারতের কোন সংযুক্তি ছিল কি ?

উত্তর : এরূপ কোন তথ্য আমার জানা নাই।

প্রশ্ন-৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হলে বাঙালির লড়াই সংগ্রামের ধারাটি এবং এ লড়াইয়ের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো লক্ষ্য করতে হবে। ৪৬ সালের স্বাধীন অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক বিরোধীদল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ৫২-র ভাষাসংগ্রাম, স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠা, সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন--এ সকল আন্দোলনে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা শাণিত হয়েছে, দাবি আদায়ের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে, এবং নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীরা ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি দুটি প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে যা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনে অনেক বিতর্কেরও সূত্রপাত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি এই যে, পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে কি বাঙালির জাতীয় অধিকার আদায় সম্ভব, না কি অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই যে, নিরঙ্কুশ জাতীয় অধিকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতর থেকে সম্ভব, নাকি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ? আগরতলা মামলাটি সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন এই যে, এ দুটি প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট জবাব এ মামলার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। এ মামলার অভিজ্ঞতাই বলে দিয়েছে যে, (১) আমাদের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করতে হবে, এবং (২) স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সশস্ত্র লড়াইয়ে নামতে হবে। প্রকৃত পক্ষে আমরা যারা এই মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলাম, অভিযুক্ত না হলেও যারা আমাদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সম্পৃক্ত ছিলেন, তারাই সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কায়েমের পথিকৃৎ--অগ্রবাহিনী। ৭০-এর নির্বাচনে এ দেশের মানুষ ৬ দফাকে ভোট দিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে। ৭১ সালে অস্ত্র হাতে নিয়েছে তাদের প্রাণের এ আকাঙ্ক্ষাকে অর্জন করার জন্যই। এভাবেই মুক্তি সংগ্রামের উত্তরণ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধে। আগরতলা মামলার ভূমিকাটি এখানে অনন্য এবং সন্দেহাতীত ভাবে সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-৯ : শুধুমাত্র বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য :

ক) পাকিস্তান সরকারের সামরিক চাকুরীতে বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন-১০ : শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্ত/কর্মচারীদের জন্য :

ক) পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হতো ? কোন ঘটনা বা স্মৃতি মনে আছে কি ?

উত্তর : ১৯৬৪ সালের এপ্রিল থেকে ৬৬ সালের জুন পর্যন্ত আমি ঢাকাতে ন্যাভাল রিক্রুটিং অফিসার হিসাবে কর্মরত। লক্ষ্য করে দেখলাম যে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নানা অজুহাতে বাঙালিদের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানে বাধার সৃষ্টি করতো। প্রধান অজুহাতটি ছিল, পূর্ব পাকিস্তানিরা সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের জন্য দৈহিকভাবে উপযুক্ত নয়। কিন্তু কার্যত চক্রান্তটা ছিল অন্য জায়গায়। পাক আর্মিতে বাঙালিদের জন্য কোটা নির্ধারিত ছিল। দেখা গেছে, সশস্ত্র বাহিনীতে একমাত্র পশুপালন কোরেই বাঙালিদের সংখ্যা ছিল বেশী, তাও শতকরা ১৮ ভাগ। এরপরের অবস্থান ছিল ইঞ্জিনিয়ার্স মেকানিক্যাল কোরের। এখানে বাঙালি ছিল শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ। আর সাঁজোয়া বাহিনীতে বাঙালি ছিল শতকরা ২ ভাগ। পদাতিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানিদের নেওয়া হতো বেশি, শতকরা ৮০ ভাগ। এখানে অবশ্য বেশ কছু ফাঁক থেকে গিয়েছিলো যার ফলে বাঙালিরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছিল।

পকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীতে ইস্ট বেঙ্গল, বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাব এ রকম অনেকগুলো রেজিমেন্ট ছিল। প্রত্যেক রেজিমেন্টে স্ব স্ব অঞ্চলের লোক থাকতো শতকরা ৮০ ভাগ। কিন্তু ধাপ্পাবাজিটা হলো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যেখানে মাত্র ৪টা ও বালুচ-পাঠান মিলে ২০টা,সেখানে শুধু পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সংখ্যাই ছিল অন্যূন ৪০টা। সঙ্গত কারণেই সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল আশঙ্কাজনকভাবে কম। কিন্তু যখনই বাঙালিদের সশস্ত্র বাহিনীতে নেওয়ার কথা উঠতো, তখনই স্বার্থান্বেষী মহল অজুহাত হিসেবে বলতো, যোগ্যতা নেই বলে তাদের সংখ্যা কম। এই অজুহাতটাকে আরো যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার জন্য বাঙালিদের শারীরিক মাপের যোগ্যতা শিথিল হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা তেমন বাড়তে পারতো না। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সশস্ত্র বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদানের শারীরিক যোগ্যতা ছিল ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি। আর পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য ছিল ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি। অফিসারদের জন্য এ পরিমাপ পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি ও বাঙালিদের জন্য ৫ ফিট ২ ইঞ্চি ই, পি, আর, এ যোগদানের শারীরিক মাপকাঠি ছিল ৫ ফিট ৬ ইঞ্চ। উল্লিখিত শারীরিক যোগ্যতার সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের উপযোগী প্রচুর লোক পাওয়া যেতো পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ পাকিস্তানি সামরিক চক্র সর্বদা অজুহাত দেখাতো যে, পূর্ব পাকিস্তানে যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ জাতিগত নিপীড়ন সৃষ্টিকারীদের এসব ভাঁওতাবাজি তেমনভাবে বুঝতে

Dhaka University Institutional Repository

পারতো না। কিন্তু নৌবাহিনীর লোক হিসেবে আমার কাছে তা ছিল দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। বঞ্চনার অনেক তথ্যই আমার কাছে ছিল। এ ধরনের অনেক তথ্য আমি ডঃ আলীম আল রাজীকে সরবরাহ করেছি। তিনি তা সংসদে উত্থাপনও করেছেন। এ নিয়ে জনমনে বেশ আলোড়নও সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছে আর অজানা থাকেনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে সামরিক সদর দফতরের কর্তারা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। এই ঘটনার সূত্র ধরেই পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরতদের কোনো ধরনের যোগাযোগ না রাখার জন্যে একটি সার্কুলার ইস্যু করা হয়।

আর একটি বিশেষ ঘটনার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, যার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পশ্চিমাদের বিমাতাসূলভ আচরণ স্পষ্ট হবে। আমি ঢাকায় থাকার সময়ে নৌবাহিনীর ক্যাডেট হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ২ জন তরুণ নির্বাচিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী তাদের আমার কাছে রিপোর্ট করার কথা। নৌবাহিনীর ঢাকাস্থ লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল নির্বাচিত ক্যাডেটদের বিমানযোগে করাচি পাঠানোর যথাযথ ব্যবস্থা করা। নির্বাচিত দুজন ক্যাডেটের মধ্যে একজন রেলওয়েতে কর্মরত জনাব রিজভী সাহেবের ছেলে, দিল্লীওয়ালা। সে যথাসময়ে আমার কাছে রিপোর্ট করে। আমি যথারীতি তাকে করাচি পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। আর একজন ক্যাডেট সোলায়মান। বাড়ি ভোলায়। সে কিন্তু সময়মত নিয়োগপত্র পায়নি। আসলে পশ্চিমা নিয়োগ কর্তারা ষড়যন্ত্র করেই তার নিয়োগপত্র দেরি করে পাঠায় যাতে সে যথাসময়ে যোগদান করতে না পারে। লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেকের নিয়োগপত্রের ১টি করে কপি আমার কাছেও আসতো। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে এটা করা হতো। প্রথমে ঐসব নিয়োগপ্রাপ্তদের টেলিগ্রামের কপি আসতো, পরে আসতো চিঠির কপি। আমি একটি টেলিগ্রামের কপি পেলাম, যেটি করাচি থেকে কোনো এক মাসের ২২/২৩ তারিখে ভোলার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে এবং পরবর্তী মাসের ২ তারিখের মধ্যে সোলায়মানকে করাচিস্থ ন্যাভাল একাডেমীতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। টেলিগ্রামটি পেয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ ভোলা থেকে কোনো অবস্থাতেই করাচিতে উক্ত সময়সীমার মধ্যে তার পক্ষে পৌছানো সম্ভব নয়। আমার মনে হলো এটিও একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

বাঙালি হিসেবে সোলায়মানের প্রতি আমার মন সহানুভূতিশীল হলো। আমি তার জন্য কিছু করতে উদ্যোগী হলাম। তাৎক্ষণিকভাবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, ক্যাডেট সোলায়মানের চাকুরীটা যে কোন মূল্যে বহাল রাখার ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। বিষয়টা নিয়ে ঢাকাস্থ নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারপর আমি বের হলাম সোলায়মানকে খুঁজতে। সে তখন ঢাকতেই অবস্থান করছিলো। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সোলায়মানকে পাওয়া গেল। সে তখন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। তার সঙ্গে কথা বললাম। তার সাথে আলাপ করে আমার মনে হলো, সে নৌবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক নয়। তাকে আমি আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেক বুঝালাম। "বাঙালি হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু

Dhaka University Institutional Repository

না কিছু করা উচিত। আর বাঙালিদের জন্য কিছু করতে চাইলে নিজের দেশও জনগণের স্বার্থে তোমার এই চাকরীতে যোগ দেওয়া উচিত"। অবশেষে সে রাজি হলো। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তখন দ্রুত করাচির ন্যাভাল হেড কোয়ার্টারে আমি একটি সিগন্যাল পাঠালাম। সিগন্যালটি ছিল এরকম, "টেলিগ্রাম পেয়েছি কিন্তু করাচি থেকে ২২ তারিখে পাঠানো টেলিগ্রামের নির্দেশ মতো ভোলা থেকে কোনো অবস্থাতেই সোলায়মানের পক্ষে ২ তারিখে করাচি পৌছানো সম্ভব নয়। যা হোক, ক্যাডেট সোলায়মানের জন্য আমি টিকিটের ব্যবস্থা করেছি। সে আসা মাত্রই করাচি ন্যাভাল একাডেমীতে রিপোর্ট করার জন্য পাঠানো হবে"। একই সাথে সিগন্যালের একটি অনুলিপি রাওলপিন্ডি সামরিক সদর দফতরের এ. জিস ব্রাঞ্চে জেনারেল আতিকুর রহমানের কাছেও পাঠালাম। কিন্তু কেন জানি মনটা খুঁত খুতঁ করতে লাগলো। মনে হলো, এরপরও সোলায়মানের চাকরীটা হয়তো হবে না। ভাবলাম, সিগন্যালের একটা কপি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েটে পাঠিয়ে দেই, যা হবার হবে। শেষ পর্যন্ত তাই-ই করলাম। আর এটা নিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যাভাল হেড কোয়ার্টারে তুলকালাম কান্ড শুরু হয়ে গেল।

যাহোক, ন্যাভাল হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে অনেক গালাগালি দেবার পর টেলিফোনে লেঃ কমান্ডার রশিদ বললেন--"সোলায়মানের চাকুরী থাকবে, দুশ্চিন্তার কারণ নেই।" এর পরেই উৎকণ্ঠার সাথে জিজ্ঞেস করলেন--"In the mean time, have you released this measage to the Press also ?" এতক্ষণে ওদের রাগ আর উৎকণ্ঠার পটভূমি আমার কাছে কিছুটা স্পষ্ট হল।

৬৬ সালে পি-এন-এস করসাযে চাকুরীকালীন আরেকটা ঘটনা। নৌবাহিনীতে রিকোয়েস্ট ডিফলটার নামে একটি কার্যক্রম প্রচলিত আছে। কমান্ডার অথবা ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে থেকে নাবিকদের অপরাধের বিচার-আচার কিংবা তাদের কোনো প্রার্থনা থাকলে সেটা মঞ্জুর করেন। ডিভিশনাল অফিসাররা নিজ নিজ ডিভিশনের অন্তর্ভূক্ত নাবিকদের হিসাবে "রিকোয়েস্ট ডিফলটার" অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন। কারাসাযে ডিভিশনাল অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে আমিও এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতাম।

এমনি একটি রিকোয়েস্ট ডিফলটার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারাসাযের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আবেদ। ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে আমিও সে অনুষ্ঠানে যথারীতি হাজির ছিলাম। নৌবাহিনীতে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফান্ড নামে একটা ফান্ড ছিল। এ ফান্ড থেকে টাকা নেয়ার জন্য অনেকে আবেদন করতেন। ডিভিশনাল অফিসার রাজি হলে ক্যাপ্টেন আবেদ তা মঞ্জুর করতেন। রিকোয়েস্ট ডিফলটারে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের একটি ছেলের দরখাস্ত পড়া হলো। আবেদনকারী জানিয়েছে যে, ঝড়-বন্যায় তার বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সে জন্যে ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে সে কিছু টাকা কর্জ চায়। ক্যাপ্টেন আবেদ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ি ? ছেলেটি স্যালুট দিয়ে বললো, স্যার। ক্যাপ্টেন আবার জোরের সাথে প্রশ্ন ছুড়লেন, তোমার বাড়ি না তোমার বাবার বাড়ি ? ছেলেটি এবারে ভ্যাব্যচ্যাকা খেয়ে গেল। ক্যাপ্টেন আবেদ বলে উঠলেন, "Why don't you ask loan from your own government ?" অফিসারদের সামনে

Dhaka University Institutional Repository

এমনিতেই নাবিকরা জড়সড় হয়ে থাকে। তদুপরি ক্যাপ্টেন আবেদের প্রশ্নের বহরে বাঙালি নাবিকটির অবস্থা বেশ করুণ হয়ে পড়লো। আমিও বেশ অবাক হলাম আবেদ সাহেবের ব্যবহারে, সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেলাম তার শেষ প্রশ্নটিতে।

ছেলেটি আমার ডিভিশনে কাজ করতো না, তাই আমার ঐ মুহূর্তে কিছু করণীয় ছিল না। যদিও ক্যাপ্টেনের শেষের বাক্যটি সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জিজ্ঞাসা ছিল এবং প্রতিবাদ করার অভিপ্রায়ও ছিল। তবুও অন্য ডিভিশনের নাবিক আমি রীতি ভঙ্গ করে কিছু বললাম না। আমি শুধু অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম ১৮ বছরের দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করা ছেলেটির দিকে। আমি লক্ষ্য করেছি তার প্রতিক্রিয়া, বুঝতে চেষ্টা করেছি তার চোখের ভাষা। আমার কেবলই মনে হতে থাকলো--এসব বড় কর্মকর্তারা যদি বাঙালি তরুণ নাবিকদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করে, তবে কেন তাদের পূর্ব বাংলার কথা মনে হবে না, কেন তারা স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের কথায় উত্তেজিত হবে না, উৎফুল্ল হবে না ? আর এসব তরুণ যদি সঠিক নেতৃত্ব না পায় তাহলে কি পরিণতি হবে ? আর তাইতো তারা আজ রহমান সাহেবের তথা স্বাধীন বংলা আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বে বিস্ফোরণোন্মুখ। রিকোয়েস্ট ডিফলটার অনুষ্ঠানে এরপর এক পাঞ্জাবী ছেলের দরখাস্ত পড়া হলো, সে তার বোনের বিয়ে উপলক্ষে টাকা কর্জ চায়। ক্যাপ্টেন আবেদ হুঙ্কার ছেড়ে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন এবারে বললেন, "ধার-কর্জ করে উৎসব করা ইসলাম বরদাশত করে না। আমিও সমর্থন করি না।" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন কামান্ডার রিজভীর দিকে, তার মতামত চাইলেন। তিনি বললেন, "জী স্যার, আমিও সমর্থন করি না, তবে এবারের মতো দেয়া হোক।" অতঃপর পাঞ্জাবী ছেলেটির আবেদন মঞ্জুর করা হলো। সে বোনের বিয়ের জন্য টাকা ধার পেলো।

এ যাবৎ কোনক্রমে আমি এসব ন্যক্কারজনক ঘটনা সহ্য করছিলাম, কিন্তু এই পাঞ্জাবী ছেলের বোনের বিয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করায় আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। অধিবেশন শেষ হলো, যে যার ঘরে ফিরে গেল। আমি কমান্ডার রিজভীর রুমে গেলাম, স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, "স্যার আপনারা যে পূর্ব পাকিস্তানি নাবিকটির নিজ গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে কর্জ নেবার কথা বললেন, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান কি আলাদা রাষ্ট্র ? আপনারা আসলে এ কথা থেকে কি বোঝাতে চাইছিলেন ? আমরা কি বিদেশে চাকরী করছি, ভিক্ষা চাইছি ?" আমি তখন ক্ষোভে কম্পমান, তাই এক নাগাড়ে মনের কোণে জমা হওয়া কথাগুলো বলে ফেললাম। কিন্তু আমার কথার বহর দেখে রিজভী সাহেব অত্যান্ত ক্ষেপে উঠলেন। আমি অবশ্য না রেগে শিষ্টতা বজায় রেখে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "স্যার আপনার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ কি ? আপনি আমার সুপেরিয়র অফিসার। আমি না বুঝলে আমাকে বোঝানো আপনার দায়িত্ব। আপনি বোঝাতে পারলে ভালো, না পারলে তাও সাফ বলে দেন, ক্ষিপ্ত হওয়ার কি আছে ?" এবারে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "Go to your captain, he knows. I do not know." আমি ভাবলাম ভালোই হলো।

Dhaka University Institutional Repository

আবেদ সাহেবের সেক্রেটারী লেঃ মজিদের কাছে গট গট করে বললাম, "I like to see the Captain." তিনি বললেন, "একটা স্লিপ দেন।" আমি বললাম, "তার আর দরকার নেই। আমি যাব।" লেঃ মজিদ মাদ্রাজী, অত্যান্ত শরীফ ভদ্রলোক। পরবর্তীতে আমি যখন জেলে যাই, তখন তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে আমার পরিবারের খোঁজখবর রেখেছেন। আমি ক্যাপ্টেন আবেদের রুমে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালাম। আমায় দেখে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। সম্ভবত আমার মুখের অবস্থা দেখে তিনি পরিস্থিতি কিছুটা আঁচ করে নিয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'What' ? আমি বললাম, "রিজভী সাহেব আমাকে আপনার কাছে পঠিয়েছেন।" এবারে তিনি একটু নরম হলেন।

আমিও এ্যাটেনশন অবস্থা থেকে স্ট্যান্ড এ্যাট ইজ হয়ে একটু রিলাক্স করে দাঁড়ালাম। এবারে ক্ষিপ্ত না হয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বিনীত স্বরে আমি বললাম, "স্যার আজকের রিকোয়েস্ট ডিফলটারে এক পর্যায়ে আপনি বললেন, To ask loan from own govt. আসলে এটির সঠিক অর্থ কি ? বাঙালি নাবিকরাতো আমার বাঙালি অফিসার হিসেবে এ প্রশ্ন করবে, তখন আমি কি ব্যাখ্যা দেব ? তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়াতো অফিসার হিসেবে আমার দায়িত্ব।" লক্ষ্য করলাম, ক্যাপ্টেন আবেদ আসলে ভেতরে জ্বলছে, চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। আসল জায়গায় আঘাত পড়েছে। কি আর জবাব দিবেন তিনি! তাই সিনিয়র অফিসার সুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি আমায় বলে বসলেন, "Now you get out. I will explain it later on." আমি বের হয়েও এলাম। বুঝলাম এবারে আমার হাজামত হবে। রহমান সাহেবকে ঘটনাটি বললাম।

প্রশ্ন-১০ (খ) সশস্ত্র বাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল বহিনীর সদস্য হয়েও কেন এরকম একটি বিদ্রোহমূলক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর : উত্তর নং ১ ও ২ এ প্রদত্ত আমার বক্তব্যে এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে।

কমান্ডার (অবঃ) আবদুর রউফ
৩০শে জানুয়ারি ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন

প্রশ্ন-১ : ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আপনি কি কখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কখন থেকে আপনি স্বাধীনতার চিন্তা করেছিলেন ? কোন পন্থায় এবং কিভাবে আপনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চিন্তা করেছিলেন ? এবং সে লক্ষ্যে আপনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ?

প্রশ্ন-২ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল, সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

প্রশ্ন-৩ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কি?

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক এর বক্তব্য

তাং ১১-৯-২০০৩ ইং

ঢাকা।

প্রশ্ন-১ : ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আপনি কি কখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কখন থেকে আপনি স্বাধীনতার চিন্তা করেছিলেন ? কোন পন্থায় এবং কিভাবে আপনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চিন্তা করেছিলেন ? এবং সে লক্ষ্যে আপনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের অনেক পূর্ব থেকেই আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলাম। এ চিন্তা পর্যায়ক্রমে পরিপক্ক হতে থাকে। ১৯৬২ সনে মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়। একই বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সনে কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিশের গুলিতে ২ জন বাঙালি নিহত হয়। ফলে আমাদের মনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা আরো গভীর হয়। তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। তাঁর লেখা বই "Friends not Masters" পড়ে আমাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঐ বইতে তিনি লিখেছেন, "একটি অধঃপতিত জাতির সমস্ত নিদর্শন বাঙালিদের মধ্যে আছে। বাঙালিরা কাপুরুষ ; তারা শুধু জুতা সাফ করতে পারে"। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতেই হবে এ ব্যাপারে আমরা কয়েকজন একমত হই। ১৯৬২ সালেই আমাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠক হয় জনাব সিরাজুল আলম খান এবং আমার মধ্যে। এবং দ্বিতীয় বৈঠকে আমাদের ২ জনের মধ্যে যোগ দেন মরহুম কাজী আরেফ আহমেদ এবং অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। (অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদকে পরে বাদ দেয়া হয়)। ১৯৬৩ সনে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করি। তারই ধারাবাহিকতায়, ১৯৬৪ সনে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" গঠন করা হয়। পরিষদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে গঠিত হয় :--

১। জনাব সিরাজুল আলম খান
২। আমি (অর্থাৎ জনাব আবদুর রাজ্জাক)
৩। মরহুম কাজী আরেফ আহ্‌মেদ

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মূলতঃ ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেছিলাম। প্রতি থানা থেকে ১০ জন করে ছাত্রলীগের কর্মীকে আমাদের বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। প্রথম দিকে ২০০ থানায়, পরে ৩০০ থানায় এবং আরো পরে সব থানায় ছাত্রলীগের বাহিনী গঠন করা হয়। গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ছাত্রলীগের এ সকল নির্বাচিত কর্মীদের গোপনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যন্ত channel of command নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

১৯৭১ সনের ১৮ জানুয়ারি তারিখে গেরিলা বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ড নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে পূর্ণগঠন করা হয় :--

১। জনাব সিরাজুল আলম খান

২। মরহুম শেখ ফজলুল হক মণি

৩। আমি (অর্থাৎ জনাব আবদুর রাজ্জাক)

৪। জনাব তোফায়েল আহমেদ

প্রশ্ন-২ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল, সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক অবিভক্ত ভারতের পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে অবিভক্ত বাংলাসহ একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (independent states) গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা ১৯৪০ সনের ২৩-২৪ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। ইংরেজিতে লেখা প্রস্তাবটি ছিল, "Muslim majority areas of eastern and north-western India may form independent states". ঐ সময় থেকে এ প্রস্তাবটি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত হয়। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছে বলে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দাবি করলেও, প্রকৃত অর্থে বাঙালিদের স্বাধীনতার দাবি তখন কৌশলে উপেক্ষা করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ-দলীয় সাংসদদের সভায় (Muslim League Legislators Convention) লাহোর প্রস্তাবের "States" শব্দের 'S'অক্ষরটি মুদ্রণবিভ্রাট বলে বাদ দেওয়া হয়। সর্ব-ভারতীয় কাউন্সিল অধিবেশনেব সিদ্ধান্ত সংশোধন করার এখতিয়ার Legislators convention এর ছিল না। এতদসত্ত্বেও তা করা হয় অবিভক্ত ভারতের পুর্বাঞ্চলে অবিভক্ত বাংলায় একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের তথা বাঙালিদের স্বাধীনতার প্রস্তাব নাকচ করার উদ্দেশ্যে। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ১৯৪৭ সনেই কমপক্ষে ২টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হতো। আমরা ১৯৪৭ সনেই স্বাধীন হতে পারতাম। কিন্তু কৌশল এবং চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে ১৯৪৭ সালে বাঙালিদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই এ চক্রান্তের উদ্দেশ্য দৃশ্যমান হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন পাকিস্তানে বাঙালিরা পুনরায় পরাধীন হলো। ইংরেজরা চলে গেলেও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের স্থান দখল করে নিলো। আমরা বাঙালিরা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন হওয়া সত্ত্বেও, রাজনীতি-অর্থনীতি-প্রশাসন সবকিছু ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে। বাঙালিরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছিলো। বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলার কারণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা বার বার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলো। বঙ্গবন্ধুর অনেক সহকর্মীকে বছরের পর বছর কারাবরণ করতে হয়েছে। আমাকেও জেলে যেতে হয়েছে বার বার। হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে পাকিস্তানিরা গ্রেপ্তার করেছিলো। অসহনীয় রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিলো বাঙালিরা।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের চর্চা ছিলো না। আমরা বাঙালিরা ছিলাম গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাছাড়া , অর্থনৈতিক ভাবে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিল। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প কল-কারখানার মালিক ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানিরা। সশস্ত্রবাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিলো খুবই নগন্য। পকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকার কারণে রাজধানী-সংশ্লিষ্ট সকল সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভোগ করতো। পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনীতে। সামরিক বাহিনীর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এবং ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সনে সামরিক আইন জারী করে বাঙালিদের কণ্ঠ রোধ করা হয়। যেহেতু, সশস্ত্র বাহিনী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রনে, সেহেতু সামরিক আইন বা সামরিক শাসনের যাতাকল বাঙালিদেরই নিষ্পেষণ করার জন্য প্রয়োগ করা হতো । এভাবে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। গণতান্ত্রিক পন্থায় বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদয়ের সকল পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য সংস্কৃতির উপরও আঘাত হেনেছিলো। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ধর্ম ছাড়া কিছুই অভিন্ন ছিল না। কিন্তু পাকিস্তনিরা তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি আমদের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। সবচেয়ে বড় আঘাত আসে আমাদের ভাষার উপর। পাকিস্তানিরা চেয়েছিল উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে। কিন্তু উর্দু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় ভাষা। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬% বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও, উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের ঐক্যে চরম আঘাত হানে। উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের মীমাংসা করতে বাঙালিদের কঠোর আন্দোলনে নামতে হয়। অনেক রক্ত অনেক জীবন দিয়ে বাঙালিদেরকে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, কে জীবন দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিরা একটি প্রাচীন জাতি। আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান বাংলাদেশের ভূখন্ডে একটি উন্নত জাতিসত্ত্বা বসবাস করত। ইতিহাসের নানা লগ্নে বিদেশী আক্রমণকরীরা ভূখন্ড দখল করে নিলেও, বাঙালির সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে পারে নি। বরঞ্চ বিদেশীরা বাঙালির উন্নততর সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। বাঙালি জাতীয় চেতনাবোধ বা জাতীয়তাবাদ কখনো কখনো সুপ্ত থাকলেও তা কোনদিন বিলুপ্ত হয় নি। আক্রান্ত হলেই বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের বিশ্লেষণে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় পূর্ব বাংলার বাঙালিরা একটি পৃথক জাতির সকল শর্ত পূরণ করে বলেই তাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার ছিল ।

তাছাড়া, পাকিস্তান ছিল একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র। ধর্ম ছাড়া পাকিস্তনের দুই অংশের জনগণের মধ্যে অন্য কিছু অভিন্ন ছিল না। তদুপরি, পাকিস্তানের দুই অংশ ১২০০ মাইল ভারতীয় ভূখন্ড দ্বারা বিভক্ত ছিল। একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য পাকিস্তান নামক দেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল শর্ত পূরণ করে নি। বাঙালিরা ছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রধান দ্বন্দ্ব এবং সে কারণে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল সময়ের ব্যাপার।

আরো অনেক কারণের মধ্যে উপরোক্ত কারণসমূহ আমাকে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের চিন্তার দিকে ধাবিত করে।

প্রশ্ন-৩ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কখনো আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের আলাপ হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদিও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, বাঙালিদের স্বার্থের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন। বাঙালিদের স্বার্থ রাক্ষার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই--এই উপলব্ধি থেকেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তাঁর রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন। ১৯৪৮ সনে ছাত্রলীগ গঠন এবং ১৯৪৯ সনে আওয়ামীলীগ গঠন ছিল বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের সোপান। তিনি কখনো এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন নি। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় ১৯৬৫ সনে। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "ছাত্রলীগকে সংগঠিত করো। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে এক রাষ্ট্রে থাকা যাবে না। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমরাও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করো"। ১৯৬২ সন থেকে আমাদের স্বাধীনতার চিন্তা এবং স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু সবই জনতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর

Dhaka University Institutional Repository

আনুষ্ঠানিক নির্দেশ আমরা পাই ১৯৬৫ সনে। ১৯৬৬ সনে ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করলেন। ৬ দফার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের সকলকে আরো উৎসাহিত করে। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার কারণে স্বাধীনতার ধারণা আরো স্বচ্ছ এবং ব্যাপকতর হয়। জনগণ স্বাধীনতার ধারণার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন প্রদান শুরু করে। ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের কারণে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ মামলার সকল আসামী মুক্তি পান ১৯৬৯ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল সংবর্ধনা সভায় মুজিব ভাইকে জনগণের পক্ষ থেকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর কিছুদিন পরই বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

উত্তর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত ও প্রাক্তন বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে এরকম তথ্য বঙ্গবন্ধু নিজেই আমাদের দিয়েছিলেন ১৯৬৫ সনে। পরিকল্পনাটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে অতিশয় কম রক্তপাত এবং হয়তোবা কয়েক বছর আগেই বংলাদেশ স্বাধীন হতো। পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার কারণে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্তপাত বেশী হয়েছে। কিন্তু দেশ প্রেমিকদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যোগ বৃথা যায়নি। এই মামলার মাধ্যমেই সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে স্বাধীনতার ধারণা পৌঁছে যায়। বিশেষ করে, সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনার সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তোলে। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধুর কয়েকজন রাজনৈতিক সহকর্মী, কয়েকজন বেসামরিক বাঙালি উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রচুর সংখ্যক কর্মরত ও প্রাক্তন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের তালিকায় দেখে বাঙালিরা রোমাঞ্চিত হয়েছিল। মামলা চলাকালীন সময়ে বাঙালিরা ভাবতে শুরু করে, তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। মামলার ফলাফল নিয়ে চিন্তা তো ছিলই কিন্তু মূল চিন্তা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে মামলাটিকে সেভাবেই পরিচালিত করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের আইনজীবীগণ মামলাটিকে নিছক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পরিচালনা করেন নি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল, এই মামলার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বাঙালিদের অধিকারের প্রশ্ন এবং প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয় সাক্ষীদের জেরার মাধ্যমে তুলে ধরা এবং এসব বিষয় সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। সে কারণেই মামলার বিচার কার্য প্রলম্বিত করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ এই মামলার মাধ্যমে বাঙালি জাতি জানতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক বাঙালি সামরিক, প্রাক্তন সামরিক এবং বেসামরিক ব্যক্তিগণ সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে এবং তাঁদের ফাঁসি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রচলিত আইন সংশোধন করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে প্রহসনমূলক বিচারের ব্যবস্থা করায় সমগ্র বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ধারণাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করা শুরু করে। তৃতীয়তঃ, ঐ মামলার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সনে বাঙালি জাতি চরম ত্যাগ ও সাহসিকতার মাধ্যমে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়। চতুর্থতঃ, ঐ মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাঙালি জাতির যে বিজয় অর্জন হয়, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ণ বিজয় অর্জন করে। পঞ্চমতঃ, বঙ্গবন্ধুসহ উক্ত মামলার অভিযুক্তগণের পর্বতপ্রমাণ দেশপ্রেম, অসামন্য বীরত্ব, অদম্য সাহসিকতা, বিপ্লবী উদ্দীপনা এবং সর্বোপরি সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দৃঢ়সংকল্প ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলা চলাকালীন ট্রাইব্যুনালে কর্মরত দৈনিক আজাদ-এর চীফ রিপোর্টার জনাব ফয়েজ আহমদের সাক্ষাৎকার

তাং ১৭-৯-২০০৩ ইং
ঢাকা।

প্রশ্ন-১ : ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আপনি কি কখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কখন থেকে আপনি স্বাধীনতার চিন্তা করেছিলেন ? কোন পন্থায় এবং কিভাবে আপনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চিন্তা করেছিলেন ? এবং সে লক্ষ্যে আপনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ?

উত্তর : ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে প্রথম 'মার্শাল ল' জারির পর আমি নিজের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা চলে যাই। যেখানে আমার সাথে আমার পূর্ব পাকিস্তানের দুই বন্ধু ১। মোয়াজ্জেম (এম.পি. সিলেট) ও ২। নাসের (বার্ধক্য জানিত কারণে তিনি তাঁদের পুরো নাম ও ঠিকানা কোন কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। তাঁরা সকলেই শেখ মুজিবুর রহমান এর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বর্তমানে ফয়েজ আহমেদ ছাড়া আর কেউ জীবিত নাই।) এর সাথে দেখা হয়ে যায়। যদিও তা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। ঢাকায় সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর আত্মগোপনের জন্য কোন নিরাপদ স্থান না পেয়েই আমরা কলকাতা চলে যাই।

'মার্শাল ল' জারি হয়েছিল ৮ অক্টোবর ১৯৫৮। সপ্তাহখানিকের মধ্যেই বিরোধী মতাবলম্বীদের গ্রেফতার করা শুরু হয়। ১৮ আগস্ট "ফরেনার্স অ্যাক্ট জারি করা হলে শেখ মুজিব, আবুল মনসুর আহমেদ সহ ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয় এই আইনের আওতায়। পূর্বে গ্রেফতার কৃতদেরকে এই আইনের আওতায় আনা হয়। ২/১ মাস পর ১২ জনের মধ্যে কয়েকজনকে ছেড়ে দেয়া হয়। যাদের ছাড়া হয় নাই তাদের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন অন্যতম। উক্ত আইনের আওতায় গ্রেফতার কৃতদের মধ্যে আমার কয়েকজন বন্ধু বান্ধবও ছিল। এমন এক পরিস্থিতিতে আমিও আমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কলকাতা পালিয়ে যাই। সেখানে আমার উক্ত দুই বন্ধুর সাথে আমার দেখা হয়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আমাদের বন্ধু নাসেরের কলকাতার বাসায় প্রায়ই আলাপ আলোচনা করতাম। এমনকি আলাপ-আলোচনার ২/৩ দিনের মধ্যেই আমরা তিনজনই তিনটি মৌলিক সমস্যার বিষয়ে একমত হই। সমস্যাগুলো হলো :

১। পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পশ্চিমাদের বিমাতাসুলভ আচরণ। পক্ষপাতিত্ব, অর্থনৈতিক শোষণ, নির্যাতন ও মার্শাল ল, জারির চিরস্থায়ী প্রবণতা থেকে মুক্তি পেতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত করা ছাড়া উপায় নাই। কেননা পশ্চিমাদের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান যতদিন থাকবে মার্শাল ল, নির্যাতন, নিস্পেষণ চলতেই থাকবে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে।

২। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব এ ব্যাপারে কিরূপ হবে সে বিষয়টিও আমাদের বুঝতে হবে।

৩। উক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেই।

প্রশ্ন-২ : পাকিস্তান তো একটি স্বাধীন দেশ ছিল, সেই স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ নামক আরেকটি স্বাধীন দেশ গঠনের চিন্তা আপনি কেন করেছিলেন ?

উত্তর : আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির বিষয়ে ঐকমত্য। সশস্ত্র পন্থায় আমাদের মুক্তি আসতে হবে-বিষয়টি আমাদের ভাবনায় ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে অস্ত্র আসবে কোথেকে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিকের অপ্রতুলতা, সর্বোপরি পরবর্তীতে দেশের নেতৃত্বে কারা আসবে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা ঐ পরিস্থিতিতে ভাবি নাই। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির বিষয়টি আমাদের কাছে মৌলিক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

প্রশ্ন-৩ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা সম্বন্ধে শেখ মুজিবের সাথে আপনার কখনও আলাপ হয়েছিল কি ?

উত্তর : শেখ মুজিবের সাথে আমার বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার স্ট্রাটেজী' সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা হয় বটে। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন করবো, কারা স্বাধীন বাংলাদেশের শাসন ভার গ্রহণ করবে এ ধরনের কোন আলোচনা সরাসরি হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন, নিস্পেষণ বাড়ার সাথে সাথে পশ্চিমাদের প্রতি শেখ মুজিবের ঘৃণা ও ক্ষোভ, একই সাথে প্রতিবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি এর থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন। আওয়ামী লীগের মাধ্যমে পাশ্চিমাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাঁর মনের মধ্যে বাংলাদেশের একটা পৃথক সত্তার প্রতিচ্ছবি তখন থেকেই বিকাশ লাভ করতে থাকে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর বঙ্গবন্ধু রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেন। সেখান থেকে ফেরার পর আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, 'এ অঞ্চলের নাম কি হবে ?' তিনি বলেছিলেন, "যদি স্বাধীন করতে পারিস তবে সে দেশের নামকরণ করা হবে 'বাংলাদেশ'। আমি অবশ্য তাঁকে বলেছিলাম 'পূর্বদেশ' নামকরণ করতে। কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন নি। আমি তখন পূর্বদেশ পত্রিকার চীফ রিপোর্টার ছিলাম। তখনই উক্ত কথোপকথন হয়। যা ছিল একান্তই গোপন আলোচনা। শেখ মুজিবের সাথে উক্ত কথোপকথনের পর আমার 'অবজারবেশন' হয়েছিল শেখ মুজিব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এ ব্যাপারে তার কোন দ্বিধা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন-৪ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা মামলার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ?

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা মামলার ভূমিকা ছিল অসাধারণ। এ মামলা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ মামলার অভ্যুদয় না ঘটলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এত দ্রুত অগ্রসর হতো না। মুক্তিসংগ্রাম অবশ্যই হতো কিন্তু তার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হতো। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে এ মামলার অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৬৯ সালে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটে তার কৃতিত্ব ছিল মাওলানা ভাসানীর। আর মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের জেল থেকে প্রেরিত চিরকুট পেয়েই আন্দোলন সংগ্রামের জন্য মাঠে নেমে পড়েন। রাজনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে অভ্যুত্থানের পরিবেশ তৈরি করেন। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি ড. S. A. Rahman প্রাণের ভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। তাঁর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন অভিযুক্ত বিজয়ী বীর হিসেবে কারাগার থেকে বেড়িয়ে আসেন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সূত্র হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, যা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী করেছিল। শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পান তাও এই মামলার কারণে। ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় মুক্তিযুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করেছে। তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনস্বীকার্য ধাপ বা পদক্ষেপ। ইতিহাসে এ ঘটনার উপস্থিতি থাকতেই হবে এবং অবশ্যই গুরুত্বের সাথেই একে ইতিহাসে স্থান দিতে হবে। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে বা উপেক্ষা করে তা করা হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে বা উপেক্ষা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে না। তাহলে সে ইতিহাস সঠিক বা নির্ভূল হতে পারবে না। ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ সকলকেই ১৯৬৮ সালের ঘটনাবহুল এ ঘটনার সম্মুখীন হতেই হবে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস রচনার জন্য।

মামলা চলাকালীন সময়ে আমি দৈনিক আজাদ পত্রিকার চীফ রিপোর্টার হিসেবে আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকার অনুমতি পেয়েছিলাম। তখন আমি অভিযুক্তদের মধ্যে আন্ততঃ ২০ জনের সাথে আলাপ করে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হই। সুতরাং আজ এ ঘটনাকে মিথ্যা বলার কোন অবকাশ নেই। তাহলে ইতিহাসকেই মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হবে। '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল কেন ? শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের মুক্তির জন্য। শেখ মুজিব কোথায় ছিলেন ! কারাগারে ছিলেন। কেন ছিলেন ! এই মামলার কারণে। সুতরাং এই মামলা অবধারিত সত্য। যাকে ইতিহাস থেকে চাইলেই মুছে ফেলা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো আজকে তাদের অযোগ্যতাকে ঢেকে রাখার জন্য এই মামলার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যাচ্ছে যা তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় অজ্ঞতাকেই নগ্নভাবে প্রকাশ করছে। রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদরা এই ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার না করলে নিজেদের কুপমন্ডুকতাকেই প্রকাশ্যে তুলে ধরবেন। আর তাতে করে সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সন্তানেরা।

আওয়ামী লীগের দলীয় সিদ্ধান্ত বা অনুমতি না নিয়েই শেখ মুজিব অভিযুক্তদের সাথে পরিকল্পনার ব্যাপারে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। সেখানে তার দলের অনেকেই অজ্ঞতা বশতঃ ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ। কিন্তু শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভবে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন যা অভিযুক্তদের বিবরণে উঠে এসেছে। আর ৩৫ জন অভিযুক্তদের অনেকেই ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক ও বেসামরিক কর্মরত ও প্রাক্তন। আর অনেকেই নিজেদের অবস্থানগত দূর্বলতার জন্য এই ঘটনার ব্যাপারে সদিচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও সোচ্চার হতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে ঘটনাকে বেমালুম অস্বীকার করার প্রবণতা অবশ্যই অনুচিত হবে। এ কথা সত্য যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মনে মনে ঘটনার মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিলেও বাইরে তা প্রকাশ করতে চান না, শুধুমাত্র নিজেদের হীনম্মন্যতার কারণে। যা দেশের সাধারণ জনগণ কখনও প্রত্যাশা করে না রাজনীতিবিদদের কাছে। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ ঘটনার আবশ্যকতাকে আজ হোক কাল হোক স্বীকার করে নিতে হবে ইতিহাসবিদদের।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট--২

মামলার সরকারি ভাষ্য

১৯৬৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অধ্যাদেশের ইউ/এস-৫ ধারা মতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলার ভাষ্য আদালতে উপস্থাপন করা হলো।

যথাযথ সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা যাচ্ছে যে :

১. গোপনসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণে এমন একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটন করা হয় যার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলবারুদ ও অর্থ ব্যবহার করে পাকিস্তানের একাংশে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় এবং কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির সঙ্গে সম্পৃক্ত আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়।

২. ঐ সকল ব্যক্তিদের কয়েকজনের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত তথ্য-প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, তারা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির এবং কিছু নির্দিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ছদ্মনাম ব্যবহার করছে এবং একটি 'ডি ডে-তে করণীয় কার্যাদি সম্পর্কে ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা অনুরূপ ছদ্ম শব্দাবলী ব্যবহার করছে।

৩. তাদের প্রধান কর্মপরিকল্পনা ছিল সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে তাদেরকে অচল করে দেয়া। কমান্ডো স্টাইলে অভিযান চালিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তারা অগ্রসর হয় :

ক. সামরিক বাহিনীর থেকে আসা লোকদের এবং প্রাক্তন সৈনিক ও বেসামরিক চাকরিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করা, যারা কার্যকরভাবে একটি অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

খ. ভারত থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়াও স্থানীয় উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদে রাখা।

গ. মিথ্যা প্রচারণার সাহায্যে সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যহীনতা সৃষ্টি করা। এবং

ঘ. জোরপূর্বক সামরিক কৌশলগত স্থানসমূহ দখল করার উদ্দেশ্যে 'ডি ডে'-এর মত একটি সুযোগের মুহূর্ত নির্ধারণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এই ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় পাকিস্তানের যারা ঐ অভিযান কার্যকরী করার দায়িত্বে ছিলেন তাদের প্রতিনিধিরা এবং ভারতীয় পক্ষের যারা অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই ষড়যন্ত্রকে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছিল তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১২ ই জুলাই ভারতের আগরতলায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫. এই ষড়যন্ত্র এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নীচের অধ্যায়সমূহে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে, যখন অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো সভার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তখন ষড়যন্ত্রের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হয়েছে। যদিও তারা তাদের প্রায় প্রতিটি সভায়ই ঐ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো। এই অভিযোগনামার সঙ্গে পাঁচটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে--'তালিকা -এ', 'অভিযুক্তদের তালিকা', 'সাক্ষীর তালিকা', 'তথ্য-প্রমাণের তালিকা', ও 'জিনিসপত্রের তালিকা'--সংযোজনী-১ এ এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়ছে। সংযোজনী-২ এ অভিযুক্তদের ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম যখন প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে তখনই তার সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন ঐ নামটি পুনরায় ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েছে তখন শুধুমাত্র যাতে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় সে রকমভাবেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত তালিকাসমূহের যে কোনোটির অন্তর্ভূক্ত কোনো ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করার বেলায় ঐ ব্যক্তি যে তালিকার অন্তর্ভূক্ত সেই তালিকার নাম এবং ঐ তালিকার কত নম্বর ক্রমিকে তার অবস্থান সেই নম্বরটি উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে, যখন প্রথমবারের মত কোনো স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তখন ঐ স্থানের অবস্থান প্রভৃতি বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং পরে যখন আবার ঐ স্থানটির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েছে তখন অন্যান্য স্থান থেকে ঐ স্থানটিকে আলাদা করে বুঝানোর জন্য যেটুকু উল্লেখ করা দরকার তা-ই করা হয়েছে।

৬. ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এই মামলার ১ নম্বর আসামী মেখ মুজিবুর রহমান করাচি সফর করছিলেন। এই সফরকালে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন), আসামী নম্বর-২ কর্তৃক আহূত একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৪ সালের শুরুতে তার নিজ বাসভবন--বাংলো নং-ডি/৭৭, কে.ডি.এ. স্কীম নং ১, করাচিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই অভিযোগনামার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ৪নং আসামী প্রাক্তন বিশিষ্ট নাবিক সুলতান উদ্দিন আহমদ, ৫নং আসামী বিশিষ্ট নাবিক নূর মোহাম্মদ এবং ১নং সাক্ষী লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একটি বিপ্লবী সংগঠন সংগঠিত করার বিষয়ে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করবেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এই মামলার ২নং সাক্ষী মিঃ কামাল উদ্দিন আহমদের বাসায়, যার ঠিকানা--৩/৪৮ এম.এস.পি. পি. স্কুল টিচারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি (মালামা আবাদ নামে বহুল পরিচিত), করাচি। এই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৪. সুলতান, আসামী নং-৪

৫. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৬. মিঃ আহমদ ফজলুর রহমান, সি.এস.পি, আসামী নং-৬

৭. মোজাম্মেল, সাক্ষী নং-১।

এই সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম বলেছেন যে, নৌ-বাহিনীতে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি জঙ্গী বাহিনী সংগঠিত করেছে এবং সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানি কর্মকর্তারাও এই বাহিনীতে যোগদান করবেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ঐ বাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য তহবিল দরকার। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে শুধুমাত্র একমতই পোষণ করেন নি, উপরন্তু তিনি বলেছেন যে, তার নিজের ধারণা এবং পরিকল্পনাও এরকমই। তিনি ঐ পরিকল্পনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে দেবার আশ্বাস প্রদান করেন। ৬নং আসামী এ.এফ. রহমান যখন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে বঞ্চনা ও বৈষম্য বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে একমাত্র জবাব হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ। তখন তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ভারতের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি বলতে পারেন না। এই পর্যায়ে ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এ বিষয়টি তিনি (শেখ মুজিবুব রহমান) দেখবেন। তিনি আরও বলেন যে, তারা যেন পরিকল্পনাটি কিছুদিনের জন্য ধীর গতিতে পরিচালনা করেন। কারণ, যদি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী জয়লাভ করতে পারে তাহলে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন না-ও হতে পারে।

৭. ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পুনরায় করাচি সফর করেন এবং ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি সেখানে অবস্থান করেন। ঐ সময়কালের মধ্যে ২নং

Dhaka University Institutional Repository

আসামী মোয়াজ্জেমের পূর্বোক্ত বাসভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

৩. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৪. এ.এফ.রহমান, আসামী নং-৬

৫. ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফিজউল্লাহ, আসামী নং-৭ এবং

৬. লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন, সাক্ষী নং-১।

এছাড়া আরও কয়েকজন উপস্থিতের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি। এই সভায় ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, একমাত্র একটি উপায়েই পূর্ব পাকিস্তানিরা আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা হলো-পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়া। তিনি ঐ পরিকল্পনার প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে তার কার্যক্রমের সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করে বিপ্লবী গ্রুপগুলোর তৎপরতা সম্প্রসারিত করতে বলেন।

৮. এই মামলার ৩নং সাক্ষী, করাচির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে কর্মরত মিঃ মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া ছিলেন মামলার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব, ৪নং আসামী সুলতান এবং ৮নং আসামী প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতজন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো একদিন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এতে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন খুবই অভিভূত হন এবং ঐ গ্রুপের কার্যকরী সদস্য হয়ে ওঠেন।

৯. ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের বাসভবনে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে সভাগুলোতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকতেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসমী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৫. হাবিলদার দলিল উদ্দিন, আসামী নং-৯ এবং

৬. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

এরা ছিলেন সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। এই সভাগুলোতে তদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাফল্য লাভের জন্য অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১০. পূর্ব পাকিস্তানে কাজকর্মের উদ্যোগনেবার জন্য সংগঠনের কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের অনুরোধে একে একে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতান ছুটি নিয়ে ঢাকায় চলে যান। তাদের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতানের মাধ্যমে ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি গ্রুপ সভার আয়োজন করে। এই সভায় গ্রুপ সদস্যদের করাচি থেকে ঢাকায় আসার জন্য যাতায়াত খরচ বাবদ ৪নং আসামী সুলতান ও ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের ঠিকানায় একটি রেজিস্টার্ড খামে করে ১৫০০ টাকা এবং টেলিগ্রাফ মানিঅর্ডারযোগে ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদের কাছে ৫০০ টাকা পাঠায় এবং তাদের উভয়কেই ঐ টাকা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পৌঁছানোর জন্য বলে। এই টাকা যথাসময়ে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল।

১১. পূর্বোক্ত সভা ১৯৬৫ সালের ২৯ আগস্ট তারিখে নির্ধারিত ছিল। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঐ সভায় যোগাদনের জন্য পি.আই.এ. বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচি ত্যাগ করেন।

১২. পূর্বোক্ত সভা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৪. সুলতান, আসামী নং-৪

৫. রুহুল কুদ্দুস, সি.এস.পি, আসামী নং-১০ এবং

৬. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বলেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষ পরিচালনা ও সহায়তায় তিনি সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তাকে সংগঠনের তালিকাভুক্ত করেছেন যারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য কাজ করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ কারেন। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম অর্থ, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য সংগ্রহের আশ্বাস দেন। সাময়িকাভাবে তিনি ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ১ লাখ রুপী দেবার কথা বলেন যা ৩নং

Dhaka University Institutional Repository

আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতানের কাছ থেকে কিস্তিতে ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা করে সংগ্রহ করে নিতে বলেন।

১৩. ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে গিয়ে তার কাছ থেকে ৭০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন।

১৪. ১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে তার কাছ থেকে ৪০০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন। আমীর হোসেন আবার ঐ টাকা থেকে ৩০০ টাকা মামলার ৩ ও ৪নং আসামী যথাক্রমে স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানের ব্যক্তিগত খরচের জন্য পাঠান এবং বাকী টাকা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পৌছানোর জন্য নিজের কাছে রাখেন।

১৫. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় যে সমস্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ছুটিতে কিংবা অস্থায়ী কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের নির্ধারিত কর্মস্থলে যেতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানেই কাজে যোগ দিতে বলা হয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতান চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে কাজে যোগদান করেন। উক্ত আসামীদ্বয় চট্টগ্রামে কর্মরত থাকা অবস্থায়ও তাদের ষড়যন্ত্রমূলক সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যান।

১৬. ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬নং আসামী এ. এফ. রহমানের বাসা--ফ্লাট নং ২১, ইলাকো হাউস, ভিক্টোরিয়া রোড, করাচিতে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৩. এ.এফ. রহমান, আসামী নং-৬

৪. সামাদ, আসামী নং-৮ এবং

৫. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

এই সভায় কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ৬নং আসামী এ.এফ. রহমান যুক্তরাজ্য থেকে একটি রেডিওট্রান্সমিটার সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার জন্য চেষ্টা করা হবে। সংগঠনের যাবতীয় কাজের জন্য ঐ সময় ৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের অতিথি হিসাবে অবস্থানরত মামলার ৪নং সাক্ষী মিঃ কে. জি. আহমদের অফিসটি ব্যবহারের বিষয়টিও সভায় স্থির করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ঐ একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) অন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় মামলার ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের বাসা অফিসার্স কোয়ার্টার, কারাসায, করাচি এই ঠিকানায়। এই সাভায়ও উপস্থিত ছিলেন পূর্বোক্ত ১৬নং অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ষ্টুয়ার্ড মুজিব, ৩নং আসামী এবং সুলতান, ৪নং আসামী পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করে চলেছেন এবং খুব শীঘ্রই ৮নং আসামী সামাদ এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে গ্রুপের কাজকর্মের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম আরও বলেন যে, গ্রুপের কাজের সাফল্যের জন্য ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করা দরকার এবং তাদের সবাইকে অস্ত্র সজ্জিত করে যদি প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত কয়েকজন অফিসার দ্বারা পরিচালনা করা যায় তাহলে অবিলম্বে তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারবেন। পূর্বোক্ত ১৬নং অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোও এই সভায় আলোচনা করা হয়।

১৮. একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহর আহ্বানে তার বাসা--৩২৯/২, কোরাঙ্গী ক্রীক, করাচিতে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেন।

১. সুলতান, আসামী নং-৪

২. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক, আসামী নং-১১

৪. ওয়ারেন্ট অফিসার মুশারফ এইচ. শেখ., সাক্ষী নং-৫

৫. সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-৬ এবং আরও কয়েকজন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় নি।

এই সভায় ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ এবং ৪নং আসামী সুলতান বারবার বলছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঐ অঞ্চলকে আলাদা করে ফেলা এবং একটি সফল সামরিক বিদ্রোহ ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়। সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে কাজকর্মের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

১৯. ১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের করাচি থেকে বিদায় উপলক্ষে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে তিনটি টেবিল ডায়রি প্রদান করেন। ঐ ডায়রিগুলোর কয়েকটি পৃষ্ঠায় তিনি আমীর হোসেনকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তার কিছু নির্দেশাবলী এবং সব সময় মনে রাখার মত কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে দিয়েছিলেন। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে বলেছিলেন যে, ঐ কথাগুলো তিনি তার নোট বুক থেকে ওখানে লিখে দিয়েছেন। এই নোটবুকটি যে ডায়রিগুলি দেখে আসামীদের ছদ্মনামগুলো সংযোজনী-২ এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। তিনি ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের চাহিদা অনুযায়ী তাকে পৌঁছে দেবার জন্য তার কাছে (আমীর হোসেনের কাছে) একটি মানচিত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের দু'টি তালিকাও প্রদান করেন।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে বলেন এবং গ্রুপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার অধিকার প্রদান করেন। তিনি তাকে আরও বলেন যে, সংগৃহীত অর্থ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালিয়ে বাকি অর্থ যেন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করাচিতে তার কাছে পাঠানো হয়।

২০. ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকায় পৌঁছে চট্টগ্রাম যান গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। সেখানে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামী সুলতান বিদ্রোহ সংঘটনে তাদের নির্ধারিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি (৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন) চট্টগ্রামস্থ মিসকা হোটেলে তার কক্ষে একটি সভা আহ্বান করেন যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

১. ষ্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

২. সুলতান, আসামী নং-৪

৩. মিঃ ভূপতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী নামে খ্যাত), আসামী নং-১২

৪. মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, আসামী নং-১৩

৫. সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ই.পি.আর, আসামী নং-১৪

৬. ডঃ সাইদুর রাহমান চৌধুরী, সাক্ষী নং-৭

৭. প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কামান্ডার মুহাম্মদ শহীদুল হক (পি.এন.ভি.আর), সাক্ষী নং-৮

১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং আসামী সাইদুর রহমান সেখানে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে বলেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেবার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এই গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী কাজে সহায়তার জন্য ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে ৩০০০ টাকা প্রদান করেন।

২১. ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রুপের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ২নং আসামী মোজাজ্জেম ৮নং আসামী সামাদকে ঢাকায় পাঠান। তাকে চাকরি থেকে অব্যহতি দেয়ায় তার জীবনধারণের জন্য ঢাকায় আসা ছিল তার একান্তই প্রয়োজন। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম একই সঙ্গে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখে দেন যে, যতদিন তার (৮নং আসামী সামাদের) কোন চাকরীর ব্যবস্থা না হয় ততদিন

Dhaka University Institutional Repository

যেন তিনি তাকে মাসে ৩০০ টাকা করে প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লেখা এই চিঠিতে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি সবকিছুই পরশের সঙ্গে (পরশ ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ছদ্মনাম) আলোচনা করেছেন এবং ভয় করার কোন কিছু নেই।

২২. একই মাসে ৮নং আসামী সামাদ চারজন নতুন সদস্য সংগ্রহ করেন। এরা হচ্ছেন :

১. মুজিবুর রহমান, কেরানী, ই.পি.আর.পি.সি. আসামী নং-১৫

২. প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, আসামী নং-১৬

৩. প্রাক্তন নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান, আসামী নং-৯ এবং

৪. প্রাক্তন লেন্স নায়েক এ.বি.এম. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০।

এই নতুন সদস্যদেরকে গ্রুপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দীক্ষিত করেন ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন।

২৩. ১৯৬৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম সফর করেন এবং লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভার পরে তিনি ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের বাসা--১২, রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেন, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম ঠিকানায় গ্রুপের একটি সভা ডাকেন। এই সভায় উপস্থিতরা হচ্ছেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. ষ্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. মানিক চৌধুরী, আসামী নং-১২ এবং

৪. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭।

এই সভায় ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে গ্রুপের সভার জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেন।

২৪. ঐ একই মাসে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬) ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের জন্য আর্থিক সহায়তা লাভের আরেকটি উৎস বের করেন। ১১ নং সাক্ষী মুহাম্মদ মোহসিন যিনি ছিলেন ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের খালাত ভাই, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের সাহায্যে অর্থ প্রদান করার জন্য তাকে বলেন। এইরূপ কথাবার্তার পরে ১১নং সাক্ষী মোহসিন যখন ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের বসার ঘর থেকে বের হয়ে আসছিলেন, তখন ৪নং আসামী সুলতান তাকে বলেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা মোতাবেক তিনি যেন 'মুরাদ'-এর (মুরাদ ষ্টুয়ার্ড মুজিবের ছদ্মনাম) নিকট টাকা দেন। ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১১নং সাক্ষী মোহসিনের নিকট থেকে দুই কিস্তিতে ৭০০ টাকা গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের পরামর্শানুযায়ী ৬নং আসামী এ.এফ. রহমান তার স্ত্রীর মালিকানাধীন পেট্রল পাম্পে ৮নং আসামী সামাদকে ম্যানেজার পদে চাকুরি প্রদান করেন। এই পেট্রল পাম্পটির অবস্থান ঢাকাস্থ ভারতীয় সহকারী রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের কাছে। এই পেট্রল পাম্পের নাম গ্রীনভিউ পেট্রল পাম্প। ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের মাধ্যমে গ্রুপের সসদ্যদের লিয়াঁজো রাখা হতো। ভারতীয় দুতাবাসের কর্মকর্তারা পেট্রল নেবার অজুহাতে ঐ পাম্পে সব সময় যাতায়াত করতেন।

২৬. ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চ ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লিখে জানান যে, সে যেন ৪নং সাক্ষী কে.জি-এর কাছে ঢাকাস্থ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার কথা বলেন। তিনি চিঠিতে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে আরও নির্দেশ দেন যে, সে যেন চর্তুদিকে আঙ্গিনাসহ একটি বাড়ি ভাড়া করে রাখে যেখানে ভারত থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র রাখা হবে।

২৭. একই মাসে (মার্চের প্রথম দিকে, ১৯৬৬) ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকার মহাখালীতে একটি সভা আহ্বান করেন, যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন :

১. সামাদ, আসামী নং-৮

২. মুজিব, কেরানী, আসামী নং-১৫

৩. এম.এ. রাজ্জাক, আসামী নং-১৬

৪. সার্জেন্ট জহুরুল হক, আসামী নং-১৭

৫. আশরাফ আলী, সাক্ষী নং-৯ এবং

৬. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০।

ঐ সভায় উপস্থিত আরও কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

১. এল.এ.সি.এম.এ. নওয়াজ

২. এল.এ.সি.জেড. এ চৌধুরী

৩. সার্জেন্ট মিয়া, পি.এ.এফ।

(তদন্ত চলাকালীন সময়ে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।)

সভায় এ বিষয়ে খুবই জোর দেয়া হয়েছে যে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ। এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে।

২৮. ১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা আহ্বান করেন। দিনটি ছিল শনিবার। ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের জন্য এই দিনটিই

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ চাকরিস্থল থেকে ছুটি না নিয়েই তিনি সপ্তাহান্তে ঢাকায় গিয়ে সভায় যোগদান করতে পারেন। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ মিঃ তাজউদ্দিনের বাসা নং ৬১৭, রোড নং-১৮, ধানমন্ডি, ঢাকাতে সভা শুরু হয়। মিঃ তাজউদ্দিন ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী। তিনি এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু তিনি নিজে এই সভায় উপস্থিত থাকেন নি। এই সভায় অংশগ্রহণকারীদের ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান একটি বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পূর্বোক্ত বাড়িতে যান। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম হোসেন, আসামী নং-২

৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৪. রুহুল কুদ্দুস, আসামী নং-১০ এবং

৫. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩

এই সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম আশা প্রকাশ করে বলেন যে, 'ডি' দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ তাদের সঙ্গে থাকবে। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিটি সদস্য যেদিন অস্ত্রসজ্জিত হবে এবং প্রশিক্ষণ পাবে সেদিনেই চূড়ান্ত সময় উপস্থিত হবে। এই সভায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য তাদের একটি প্রতিনিধিদল ভারতে পাঠানোর আয়োজন করা হয়।

২৯. এর অল্প কয়েক দিন পরে ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী পূর্ব পাকিস্তানের একটি সেনানিবাসের একটি স্কেচ ৩নং আসামী আমীর হোসেনের কাছে প্রদান করেন।

৩০. ১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চিঠির মারফত ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে জানান যে, সে যেন ৬নং আসামী এ.এফ. রহমানকে টেলিফোনে জানিয়ে দেয় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের ঢাকায় স্থানান্তরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে আরও জানান যে, ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদ কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা যাচ্ছে এবং সে তাকে (আমীর হোসেনকে) পশ্চিমাঞ্চলের কাজকর্ম সম্পর্কে খবরাখবর জানাবে। একই চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় লিখেছেন যে, তিনি তার চাকর শফির (আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি) মাধ্যমে তার (আমীর হোসেনের) কাছে একটি ছোট্ট অস্ত্র পাঠাবে এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন যেন অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য আরও বেশী পরিমাণে অর্থের সংস্থানে মনোনিবেশ করে।

৩১. এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে ২নং আসামী মেয়াজ্জেম, ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট আরেকটি চিঠি লিখে ৬নং আসামী এ, এফ, রহমানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংক ড্রাফট

Dhaka University Institutional Repository

করে তার নিকট পাঠাতে বলেন। যথানির্দেশ, ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের কাছ থেকে নগদ ৫,৫০০ টাকা গ্রহণ করেন। এ থেকে ৫০০০ টাকা ১৯৬৬ সালের ৩১ মার্চ ব্যাংক ড্রাফট করে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পাঠান এবং বাকী ৫০০ টাকা আমীর হোসেন তার নিজের কাছে খরচের জন্য রাখেন।

৩২. ১৯৬৬ সালের ৩ এপ্রিল ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে যান এবং ছোট ছোট অস্ত্র ক্রয়ের জন্য আরও টাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ২নং আসামী মোয়াজ্জেম কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট থেকে গ্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে। ১নং আসামী শেখ মুজবুর রহমান তখন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের নিকট নগদ ৪,০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ৩নং আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব আবার ঐ টাকা ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে প্রদান করেন।

৩৩. এর পরের দিন ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে একটি চিঠি পান যাতে ছদ্ম ভাষায় আরও বেশী পরিমাণ টাকার জরুরি প্রয়োজনের কথা লেখা ছিল। ফলে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের নিকট পাঠান আরও টাকার জন্য। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে ২,০০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং তা ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রদান করেন। অতঃপর ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে ৬,০০০ টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম পাঠান এবং চট্টগ্রাম থেকে ঐ টাকা ব্যবসায়ীদের জাহাজের মাধ্যমে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন।

৩৪. প্রায় একই দিনে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন গ্রুপের জন্য ১০৭, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা এই ঠিকানায় একটি বাড়িভাড়া করেন। এই বাড়িতে যে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয় তার নম্বর ৮২৪৫২।

৩৫. ১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির সঙ্গে কয়েক দিন আগে তার কাছে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠানো টাকার একনলেজমেন্ট রিসিটও ছিল। এই চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় তাদের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রয়োজন তার কথা লেখেন এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে একটি বাজেট তৈরি করতে বলেন। কিন্তু ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত না থাকার কারণে তিনি স্থির করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বাজেট না চান ততদিন তিনি কোনো বাজেট করবেন না।

৩৬. এরপরই ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে আরেকটি চিঠি পান যাতে তুষারকে (৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের ছদ্মনাম)

Dhaka University Institutional Repository

জানাতে বলেন যে, তিনি ১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল স্থানান্তরিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসছেন।

৩৭. ঐ একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির বাড়িতে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। মানিক চৌধুরী সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ৪নং আসামী সুলতান সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছে। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ৪নং আসামী সুলতানের নিকট টাকা দিতে বলেন। এর তিন/চারদিন পরে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ৪১, রামজয় মহাজন লেন চট্টগ্রাম ঠিকানায় তার বাসায় ৪নং আসামী সুলতানকে ডেকে পাঠান এবং ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য তার কাছে ১৫০০ টাকা প্রদান করেন।

৩৮. একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১১নং সাক্ষী মোহসিনকে ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তার ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে ডেকে পাঠান এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে বলেন যে, তিনি বর্তমান ও প্রাক্তন সৈনিকদের সহ একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করছেন, তিনি যেন তার এ গ্রুপ পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

৩৯. ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ কিংবা মে মাসের শুরুর দিকে কোনো এক সময় চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হবার পর ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের সঙ্গে ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়ার ১০৭, দীননাথ সেন রোডে তার বাসায় দেখা করেন। দু'জনের মধ্যে সেখানে গ্রুপের পক্ষ থেকে টাকাপয়সা সংগ্রহ এবং গ্রুপের কাজকর্মের খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে গ্রুপের নামে যে বিরাট অঙ্কের অর্থ খরচের হিসাব দেখা যায় তাকে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন না। ফলে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ডঃ খালেকের বাড়িতে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট নগদ ৮,০০০ টাকা, দুটি ক্যাশ বই এবং হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাগজপত্র হস্তান্তর করেন। ডঃ খালেকের এই বাড়ির ঠিকানা : রোড নং-২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা এবং এই বাড়িতেই তখন ২নং আসামী মোয়াজ্জেম অবস্থান করছিলেন। ঐ বাড়িটির নাম 'আলেয়া'। ২নং আসামী মোয়জ্জেম তখন ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে তার দীননাথ সেনের বাসা ভাড়া মিটাবার জন্য ১৫০০ টাকা প্রদান করেন। এরপর ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

৪০. ১৯৬৬ সালের ১০ মে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নৌঘাঁটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে নিয়োগ পাবার পরই তিনি গ্রুপের একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের 'আউটার হাউস'-এ। সাইদুর রহমান এই বাড়িটি গ্রুপের

Dhaka University Institutional Repository

সভাস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এই 'আউটার হাউস' চট্টগ্রামের এনায়েত হোসেন মার্কেট এলাকায় অবস্থিত। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. মানিক চৌধুরী, আসামী নং-১২

৫. মুহাম্মদ খুরশীদ, আসামী নং-১৮ এবং

৬. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭।

১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এই সভার কার্যবিবরণীর বহির্ভূত ছিলেন।

৪১. ১৯৬৬ সালের ৬ মে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পরই তাকে ডিটেনশন দেয়া হয় এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে তাকে জেলে পাঠানো হয়। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে ডিটেনশন খাটার সময়ও অন্যান্য কতিপয় মামলায় তার বিচার হয়।

৪২. ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বোক্ত গ্রেফতার বরণের পরে তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দল তার বাসভবনে ১৯৬৬ সালের ২০ মে একটি জরুরি সভার আয়োজন করে। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এই সভায় যোগদান করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যান। সভায় যোগদান করার পূর্বে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে নিয়ে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ পি.এন ওঝার অফিসে যান। পি. এন. ওঝা সাইদুর রহমানের পরিচয় ইত্যাদি লিখে রাখেন এবং পরে আবার মাঝে মাঝে ওখানে যাবার জন্য বলেন। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সেখানে থেকে বের হয়ে আসার পরও ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী অনেকক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন।

৪৩. ১৯৬৬ সালের ২০ ও ২১ মে'র মধ্যবর্তী রাতে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কতিপয় কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন।

৪৪. ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের পর ২নং আসামী মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত 'আউটার হাউস'-এর ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের আরও দুটি সভা আহ্বান করেন। এই সভা দুটোতে উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

Dhaka University Institutional Repository

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. খুরশীদ, আসামী নং-১৮ এবং

৫. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭।

এই সভাসমূহে গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যের কাজ ভাগ করে দেয়া হয় এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত সে সম্পর্কে অলোচনা করা হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং চট্টগ্রাম নৌঘাঁটির ম্যাপ মুল্যায়ন করা হয় এবং আরও বেশী অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়।

৪৫. ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) চট্টগ্রাম পি.আই.এ-র জেলা ম্যানেজার ১২নং সাক্ষী মিঃ এম.এম. রমিজ ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সংস্পর্শে আসেন এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

৪৬. ১২নং সাক্ষী রমিজের পরই ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগ দেন ১৯নং আসামী মিঃ কে. এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি.। তিনি তখন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

৪৭. ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী এবং ৮নং আসামী সামাদ ১০০/৩, আজিমপুর রোড, ঢাকা ঠিকানায় গ্রুপের খরচে 'সিটি' নামে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। এরপর ঐ দুই ব্যক্তি তাদের পূর্ববর্তী আবাসস্থল ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের বাড়ি থেকে এই নতুন ভাড়া নেয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

৪৮. ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির তার বাসায় ১২নং সাক্ষী রমিজকে একটি ডায়েরী, একটি নোটবুক এবং একটি ফোল্ডার দিয়ে সেগুলো পড়তে বলেন। এই সমস্ত প্রমাণপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা ছিল। এতে বলা হয় যে, সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে নেয়া হবে। শিল্প-কলকারখানা জাতীয়করণ করা হবে এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপন পদ্ধতি চালু করা হবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে নতুন রাষ্ট্রের সবুজ ও গোলাপী রংয়ের পতাকাও দেখিয়েছেন।

৪৯. এরপর ঐ মাসেই (জুন, ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজের বাসায় পি.আই.এ. হাউস-৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ঠিকানায় একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. খুরশীদ, আসামী নং-১৮

৪. রিসালদার শামসুল হক, এ.সি., আসামী নং-২০

Dhaka University Institutional Repository

৫. হাবিলদার আজিজুল হক, এসএসজি, আসামী নং-২১ এবং

৬. রমিজ, সাক্ষী নং-১২।

এই সভার উদ্দেশ্য ছিল গ্রুপের প্রথম সারির কর্মীদের সঙ্গে রমিজকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। উপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছাড়াও ঐ সভায় আরও অনেক কর্মী উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।

৫০. ঐ মাসেরই শেষ দিকে (জুন, ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তার বাসা নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রামে একটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. সুবেদার রাজ্জাক, আসামী নং-১৪

৫. জহুরুল হক, আসামী নং-১৭

৬. খুরশীদ, আসামী নং-১৮

৭. রিসালদার শামসুল হক, আসামী নং-২০

৮. আশরাফ আলী, সাক্ষী নং-৯ এবং

৯. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০।

(এই সভায় আরও একজন উপস্থিত ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল সার্জেন্ট শফি। কিন্তু তার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা যায় নি)।

এই সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম সবাইকে তার ডায়রী এবং নোটবুক দেখান যাতে 'বাংলাদেশ' নামে প্রস্তাবিত নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দিকগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও সেখানে দেখানো হয়।

৫১. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসে ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যকার ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা আহ্বান করেন। তার বাসা কোয়ার্টার নং ২৫/৩, আবিসিনিয়া লাইন, করাচি ঠিকানায় আহূত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

২. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

৩. এস এ সি মাহফুজুল বারী, আসামী নং-২২

৪. মোশারফ, সাক্ষী নং-৫

Dhaka University Institutional Repository

৬. কর্পোরাল জামালউদ্দীন আহমেদ, সাক্ষী নং-১৪ এবং

৬. কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম, আসামী নং-১৫।

এই সভায়ও অন্যান্য কয়েকজন উপস্থিত ছিল যাদের নাম পরিচয় উদ্ধার করার যায় নি। এ সভায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদের উপস্থিতি। কারণ তিনি এসেছিলেন নৌবাহিনী থেকে। ৭নং আসামী মাহফিজউল্লাহর অনুরোধে ঢাকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত ১৪নং সাক্ষী কর্পোরাল জামাল এই সভায় উপস্থিত সদস্যদের সামনে পূর্ব পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রকারীদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য কয়েকজন উচ্চ পদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা তাদের ভূমিকা আরও সক্রিয় করে তুলেছেন। ১৫নং সাক্ষী সিরাজ তখন ছুটিতে যাচ্ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ তাকে বলেন যে, তিনি যেন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রকরীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রথমে ঢাকাস্থ পি.এ.এফ- ষ্টেশনে ১১নং আসামী ফজলুল হক এবং ২৩নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হক পি, এ, এফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

৫২. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসের কোনো এক সময় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ১২নং সাক্ষী রমিজ কুমিল্লা সফর করার আয়োজন করেন। তাই ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে প্রায়ই কুমিল্লা পাঠানো হয় এই খবরটি মেজর (তৎকালীন ক্যাপ্টেন) ২৪নং আসামী শামসুল আলম এ.এম.সি-কে পৌছানোর জন্য। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ১২নং সাক্ষী রমিজ মোয়াজ্জেমের গাড়িতে, হিলম্যান আই এম পি নং ৯৫৯১, করে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। তারা ২৪নং আসামী শামসুল আলমের কুমিল্লা শহরস্থ বাসভবনে যান এবং সেখানে বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিবের সাক্ষাৎ পান। ২৪নং আসামী শামসুল আলম কুমিল্লার সেক্টর কমান্ডারের দয়িত্ব পালনের কথা বলেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় সামরিক ইউনিটসমূহের অস্ত্র ভান্ডারগুলো দখল করে ফেলে তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্যকে অচল করে দিতে হবে। কিন্তু একত্রে তিনি দক্ষ জনশক্তির অভাব অনুভব করেন। তিনি শামসুল আলমকে চাকুরিরত ও প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে বলেন। ২৫নং আসামী মোতালেব বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর একজন সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন। পরে তাদের পাঁচজনকে একটি গাড়িতে করে কুমিল্লা সেনানিবাসে ২৬নং আসামী মোহাম্মদ শওকত আলী মিয়া এ.ও.সি-এর বাসায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে তাদের সঙ্গে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবও যোগ দেন । ২৬নং আসামী শওকত ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি ঢাকাতে ১৩নং সাক্ষী ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভূঁইয়া এ.ও.সি এবং ২৭নং আসামী ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা এ.ও.সি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ঐ দু'জন অফিসারই সংগঠন সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে চেয়েছেন। এমতাবস্থায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম কথা দেন যে, অবিলম্বে ঢাকাতে একটি সভা আহ্বান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. একই মাসে (জুলাই, ১৯৬৬) ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের সঙ্গে চট্টগ্রামের এক বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়। সেখানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের কাছে প্রকাশ করেন যে, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী গ্রেফতারের আগেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারীর কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দেবার কথা। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এরপর ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি মিঃ পি.এন ওঝাকে চিনেন কিনা। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এ প্রশ্নের হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। ফলে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে অনুরোধ করেন, মিঃ পি. এন. ওঝার কাছে অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দেবার জন্য। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে ঐ কাজ করতে অপরগতা প্রকশ করেন।

৫৪. অল্প কয়েকদিন পরে একদিন সকাল বেলা মিঃ পি.এন. ওঝা ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের চট্টগ্রামের বাসভবনে এসে হাজির হন এবং অনুযোগের ভাষায় তাকে বলেন যে, তার অনুরোধ সত্ত্বেও সে (৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান) তার ঢাকাস্থ অফিসে দেখা করেন নি। তখন সেইখানে বসেই ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান, মিঃ পি.এন. ওঝাকে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সংক্রান্ত ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের দেওয়া সংবাদটি জ্ঞাপন করান।

৫৫. পরের দিন মিঃ পি.এন. ওঝার নির্দেশমত ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে পূর্বোক্ত অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি সংগ্রহ করেন এবং তা চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে মিঃ পি .এন. ওঝার কাছে হস্তান্তর করেন। সেই সময় পি.এন. ওঝা ঢাকাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে একটি কোড শব্দ প্রদান করেন এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় তার সঙ্গে দেখা করতে বলার জন্য ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে বলেন।

৫৬. এর কয়েকদিন পরে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের মাধ্যমে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ভরতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসভবনে মিঃ পি.এন ওঝার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আয়োজন করেন। সেখানে পি.এন. ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে আশ্বাস দেন যে, তিনি তার (২নং আসামী মোয়াজ্জেম) প্রদত্ত অস্ত্রের তালিকা ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। এবং তিনি সাময়িকভাবে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অর্থ সরবরাহ করতে অপারগ বলে জানান।

৫৭. ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসেরকোন এক সময় ২৬নং আসামী শওকত ঢাকা সফর করেন এবং ১৩নং সাক্ষী আলীমের সঙ্গে অর্ডিন্যান্স মেসে অবস্থান করেন। ঐ সন্ধ্যায়ই ২নং আসামী মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত মেসে ১৩নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬নং আসামী শওকতের সঙ্গে দেখা করেন। ঐখানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, আগামীকাল সকালে ১২নং

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের বাসায় তিনি একটি সভা আহ্বান করেছেন। এই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. নাজমুল হুদা, আসামী- নং ২৭

৫. শওকত, আসামী নং-২৬ এবং

৬. আলীম, সাক্ষী নং-১৩।

এই সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদেরকে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত একটি ডায়েরী এবং একটি নোটবুক দেখান। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এতে দাবি করেন যে, তিনি ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ইতোমধ্যেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সভায় তিনি এই আশা ব্যক্ত করেন যে, উপস্থিত সদস্যরা যশোর এবং রংপুর অঞ্চলে কাজ পরিচালনার জন্য গ্রুপে আরও কিছু সামরিক অফিসার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন। তিনি দাবি করেন যে, চট্টগ্রামের কাজ সমাধা করার জন্য ২৮নং আসামী ক্যাপ্টেন এ.এন.এম নুরুজ্জামান এবং তার নিজস্ব নৌবাহিনী যথেষ্ট। ২৫নং আসামী মোতালেব এবং ২৪নং আসামী শামসুল আলম কুমিল্লায় যেভাবে কাজ করেছেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এই সভায় তার প্রশংসা করেন।

৫৮. ঐ একই মাসে (আগস্ট, ১৯৬৬) ২৭নং আসামী নাজমুল হুদা, ২৪নং আসামী শামসুল আলম, ১৩নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬নং আসামী শওকত দাউদকান্দি রেস্ট হাউসে মিলিত হন। তারা উপলব্ধি করেন যে, ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের ওপর অর্পিত হওয়া উচিত। তারা স্থির করলেন যে, তারা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে গ্রুপের সংগঠনের সংখ্যা ও পরিচয় জেনে নিবেন।

৫৯. ঐ একই মাসে (আগস্ট, ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ,গ্রুপের তহবিল থেকে গ্রুপের কাজের সুবিধার্থে একটি গাড়ি কিনতে সাহায্য করার জন্য ১২নং সাক্ষী রমিজকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

৬০. ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপুর হউজিং এস্টেটের ১২-৮/৮নং ফ্লাটে একটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

Dhaka University Institutional Repository

৪. শামসুর রহমান, আসামী নং-১৯

৫. শামসুল আলম, আসামী নং-২৪

৬. মোতালেব, আসামী নং-২৫

৭. নাজমুল হুদা, আসামী নং-২৭

৮. রমিজ, সাক্ষী নং-১২ এবং

৯. আলীম, সাক্ষী নং-১৩।

এই সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিনি ২৫নং আসামী মোতালেবকে বিস্তৃতভাবে বলেন যে, প্রাক্তন সৈনিকদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাদেরকে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম বিভিন্ন সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারদের আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়টি নোট করে নেন। ২৭নং আসামী নাজমুল হুদা, ২৪নং আসামী শামসুল আলম এবং ১৩নং সাক্ষী আলীম সভার কার্যবিবরণীতে হস্তক্ষেপ করে প্রস্তাব করেন যে, নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের ওপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। ১৯নং আসামী শামসুর রহমান এ বিষয়ক আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরই দেশে সামরিক আইন জারি করা হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২নং সাক্ষী রমিজ মত প্রকাশ করে বলেন যে, সামরিক অভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা হবে পি.আই.এ এবং পি.এ.এফ.-এর বিমান এবং রেডিও'র মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন এই মত ব্যক্ত করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানি রয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানি বন্দী হবে তাদেরকে বিনিময় করা হবে।

৬১. ঐ একই মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬) ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান দ্বিতীয়বারের মত ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ পি.এন. ওঝার মধ্যে পূর্বোক্ত বাড়িতে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মিঃ পি.এন. ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে বলেন যে, ভারত সরকার ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে এবং তিনি ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন।

৬২. ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে ১৯নং আসামী শামসুর রহমানের পরামর্শে গ্রুপের প্রতি প্রবীণ সামরিক অফিসারদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে তার

Dhaka University Institutional Repository

বাসা 'এ্যাংকারেজ'-এ এক সভা আহ্বান করেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী এই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. শামসুর রহমান, আসামী নং-১৯

৩. রমিজ, সাক্ষী নং-১২।

সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান দিক উল্লেখ করেন। এখানে তিনি একথাও প্রকাশ করেন যে, ভারতের সঙ্গে তিনি একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন (`a gentlemen`s agreement`) যার শর্ত অনুযায়ী তারা স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সীমা অতিক্রম করবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে-কোনো বাধা বা হস্তক্ষেপকে তারা সমুদ্র ও আকাশপথে বাধা প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বিদ্রোহকে সমর্থন করবে। কর্নেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী কথাবার্তাগুলো কেবল শুনেছিলেনই।

৬৩. ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং মিঃ পি.এন. ওঝার মধ্যে ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে তৃতীয়বারের মত একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মিঃ পি.এন. ওঝা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারতের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কারণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার তারিখ নির্ধারণ করা যায় নি। মিঃ ওঝা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ভারতের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপদেশ দেন।

৬৪. ঐ একই মাসে (অক্টোবর, ১৯৬৬) ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১১নং সাক্ষী মোহসিনের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য বলেন। ১১নং সাক্ষী মোহসিন তাকে ২০০০ টাকা দেন। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য তিন/চার লাখ টাকা প্রয়োজন। এতে ১১নং সাক্ষী ভয় পেয়ে ক্ষেপে যান এবং ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে তক্ষুণি তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

৬৫. ১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি কিংবা তার দু'একদিন আগে-পরে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ডিটেনশন আদেশ থেকে মুক্তি পান।

৬৬. ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ঢাকা আসেন এবং গ্রুপভুক্ত বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ আওলাদ হোসেন মার্কেটে ১৬নং আসামী এম.এ. রাজ্জাকের দোকানে।

নিম্নোক্তরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজউল্লাহ, আসামী নং-৭

২. এম. এ. রাজ্জাক, আসামী নং-১৬

Dhaka University Institutional Repository

৩. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং ২৩ এবং

৪. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

এই সভায় আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি। ষড়যন্ত্রকারীদের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই সভার আলোচ্য বিষয়।

৬৭. ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের চাকরি পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থানান্তর করা হয় এবং তাকে বরিশালে পোস্টিং দেয়া হয়।

৬৮. ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ১৫নং সাক্ষী সিরাজ এবং ৭নং আসামী মাহফিজউল্লাহ্ উভয়েই করাচিতে ফিরে আসেন।

৬৯. ঐ একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে মিঃ পি.এন. ওঝার ঢাকাস্থ বাসভবনে তার সঙ্গে চতুর্থ বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি তাদেরকে জানান যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ নির্ধারণ করা হবে না। মিঃ ওঝা তাদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। সভার শেষে পি.এন. ওঝা তাদেরকে নগদ ৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

৭০. ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে পি. এন. ওঝার সঙ্গে তার ঢাকাস্থ বাসভবনে পঞ্চমবারের মত সাক্ষাৎ করেন। এই সভায় পি.এন. ওঝা বলেন যে, ভারত সরকার মনে করে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার আগে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় কর্মকর্তার একটি বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। মিঃ পি.এন. ওঝা ঐ বৈঠকের স্থান হিসেবে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অনতিদূরে ভারতের আগরতলার কথা বলেন। তিনি ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ষড়যন্ত্রকরী গ্রুপের তিনজন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করতে বলেন। এই সভার পর মিঃ ওঝা তাদেরকে ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন।

৭১. ঐ একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ১২নং সাক্ষী রমিজ ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১২নং সাক্ষী রমিজের বাসভবনে মিলিত হন। সেখানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজকে বলেন যে, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ টাকা রয়েছে যা পি. এন, ওঝার কাছ থেকে সাহায্য হিসেবে পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, তারা ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুস এবং ৬নং আসামী এ. এফ. রহমানের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছে। এই সভায় ষড়যন্ত্রকারীরা সভা অনুষ্ঠান এবং সার্বক্ষণিক কর্মীদের থাকার জন্য আরেকটি বাড়ি ভাড়া করার কথা স্থির করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপ গোপন রাখার জন্য একটি লোক দেখানো ব্যবসা খোলার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ও এখানে স্থির করা হয়। ১২নং সাক্ষী রমিজ এ ধরনের একটি ব্যবসা চালু করতে সাহায্য করার জন্য ১৬নং আসামী, তার বন্ধু আবু শামস লুৎফুল হুদার নাম প্রস্তাব করেন।

৭২. ঐ একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) আরেকটি গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্বোক্ত ফ্লাটেই।

নিম্নোক্তরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সামাদ, আসামী নং-৮

৪. শামসুর রহমান, আসামী নং-১৯

৫. মোতালেব, আসামী নং-২৫

৬. রমিজ, সাক্ষী নং-১২ এবং

৭. লুৎফুল হুদা, সাক্ষী নং-১৬।

এই সভায় একটি ট্রান্সমিটার সেট সংগ্রহ করা এবং ট্রান্সমিটার আপারেটরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। এখানে আরও একটি বিষয় স্থির করা হয় যে, গ্রুপের কার্যকলাপ ঢাকা দেবার জন্য যে ব্যবসা চালু করা হচ্ছে সে বাবত ১২নং সাক্ষী রমিজের নিয়ন্ত্রাধীনে একটি বড় অঙ্কের টাকা আলাদা করে রাখা হবে।

৭৩. অল্প কয়েক দিন পরেই (মার্চ, ১৯৬৭) ১২নং সাক্ষী রমিজ ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের মাধ্যমে ২৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই টাকা থেকে ১২নং সাক্ষী রমিজ ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য ১৬নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন। বাকী ২০,০০০ টাকার মধ্যে ১৮,৬৮৯ টাকা ১২নং সাক্ষী রমিজ ষড়যন্ত্রকরীদের বিবিধ পর্যায়র কাজে খরচ হিসাবে দেখান।

৭৪. ১৯৬৭ সালের ১৪ মার্চ ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব সার্বক্ষণিকভাবে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নিয়োজিত থাকার দায়ে পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পরিত্যক্ত হন।

৭৫. এর প্রায় পনের দিন পরে (মার্চ, ১৯৬৭) ১৯নং আসামী শামসুর রহমান ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট তার বন্ধু মিঃ মুজিবুর রহমানকে সাহায্য করার জন্য একটি চিঠি লেখেন। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১৬নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাসহ ফরিদপুরে যান এবং মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট ঐ চিঠি হস্তান্তর করেন।

৭৬. ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাস্থ গ্রীন স্কোয়ারের ১৩নং বাড়িটি গ্রুপের জন্য ভাড়া নেয়া হয়। ১৯৬৭ সালের ১ মে এই বাড়িতে ওঠা হয়। নিম্নোক্ত সার্বক্ষণিক কর্মিগণ সেই বাড়িতে থাকতেন :

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসমী নং-৩

Dhaka University Institutional Repository

২. সানাদ, আসামী নং-৮

৩. দলিল উদ্দিন, আসামী নং-৯

৪. প্রাক্তন সুবেদার জালাল উদ্দীন আহমেদ, সাক্ষী নং- ১৭ এবং

৫. মোহাম্মদ গোলাম আহমেদ, সাক্ষী নং-১৮।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম তার হিলম্যান গাড়িটিও গ্রুপের কাজে ব্যবহারের জন্য ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের নিয়ন্ত্রাধীনে ঐ বাড়িতে রাখেন। এই গাড়ির নম্বর 'হিলম্যান' নং-ইবিএ-৯৫৯১।

৭৭. ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক সময় ৭নং আসামী মাহফিজউল্লাহ ১৯নং সাক্ষী কর্পোরাল হাই এ. কে. এম. এ.-এর সঙ্গে তার কোয়ার্টার ডমেস্টিক এরিয়া পি. এ. এফ. কোরাঙ্গী ক্রিক করাচিতে সাক্ষাৎ করেন। ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ সেখানে ডেকোরেশন পিস হিসেবে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড দেখতে পান এবং ১৯নং সাক্ষী হাই সাহেবের নিকট থেকে সেটি নিয়ে আসেন।

৭৮. ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ২৯নং আসামী সার্জেন্ট জলিলের বাসায় একটি সভা আহ্বান করেন। এই বাসার ঠিকানা হচ্ছে-১৪/৪ জি, ক্লেটন কোয়ার্টার্স, করাচি। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

২. বারি, আসামী নং-২২

৩. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং-২৩

৪. সার্জেন্ট আব্দুল জলিল, আসামী নং ২৯

৫. মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, আসামী নং-৩০

৬. শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬

৭. কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং-১৪ এবং

৮. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

ঐ সভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এবং সেখানে গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৩নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হক উপস্থিত সবাইকে জানান যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করার বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে সফল হয়েছেন। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 'ডি' দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকবে। সভার শেষে ৭নং আসামী মহফিজ উল্লাহ তার পকেট থেকে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড বের করেন এবং সবার সামনে সেটি নিক্ষেপ করার নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। তিনি গ্রুপের সকল সদস্যকেও অনুরূপভাবে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ অনুশীলন করতে

Dhaka University Institutional Repository

বলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ হ্যান্ড গ্রেনেডটি ২৯নং আসামী জলিলের বাসায় রেখে যান। তিনি বলেন যে, তিনি হ্যান্ড গ্রেনেডটি যেভাবে সংগ্রহ করেছেন সেভাবে আরও ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলোর ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শুরু করবেন।

৭৯. ১৯৬৭ সালের মে মাসের কোনো এক সময় ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ১৫নং সাক্ষী সিরাজের কাছে প্রকাশ করেন যে, ৬নং আসামী শামসুদ্দিনও তাদের গ্রুপের একজন সদস্য ছিল এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা ৩১নং আসামী লেফটেন্যান্ট এস. এম. এম. রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছেন। ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ করাচিস্থ কারসায অফিসার্স কোয়ার্টার্সে ৩১নং আসামী লেফটেন্যান্ট এস, এম, এম, রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিতব্য সভায় ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিন এবং ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিনকে হাজির করানোর জন্য ১৫নং সাক্ষী সিরাজকে নির্দেশ প্রদান করেন।

৮০. একই মাসের (মে, ১৯৬৭) নির্ধারিত দিনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ৩১নং আসামী লেফটেন্যান্ট রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিতব্য সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

২. লেঃ রহমান, আসামী নং-৩১

৩. মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং-৩০

৪. শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬ এবং

৫. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

এছাড়া কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যাদের পরিচয় উদঘাটন করা যায় নি। সভায় গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হবার পর ৩১নং আসামী লেঃ রহমান উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আরও বেশি সংখ্যক বাঙালি চাকরিরত কিংবা প্রাক্তন সৈনিককে গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাদেরকে পূর্ব পকিস্তানে স্থানান্তর করার পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে।

৮১. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষদিকে কোনো একদিন ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৭নং সাক্ষী জালাল এবং ৮নং আসামী সামাদকে এক সফরে পাঠান। এই সূত্রে উক্ত দুই ব্যক্তি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং যশোর সফর করেন। তারা খুলনায় প্রাক্তন সুবেদার ৩২নং আসামী এ. কে. এম. তাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সে অঞ্চলে গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। ৩২নং আসামী তাজুল ইসলাম তার সংগৃহীত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে ঐ সফরকারী দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

৮২. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ২য় কিংবা ৩য় সপ্তাহে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান পূর্বোক্ত গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তার বাসা--বাংলো নং-ই/১৬, অফিসার্স কোয়ার্টার,

Dhaka University Institutional Repository

কায়সার, করাচিতে এক সভা অনুষ্ঠান করেন। নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

২. বারি, আসামী নং-২২

৩. মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং-৩০

৪. লেঃ রহমান, আসামী নং-৩১

৫. সার্জেন্ট শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬ এবং

৬. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

আরও অল্প কয়েকজন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় নি। সভায় ৩১নং আসামী লেঃ রহমান অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপে নতুন অন্তর্ভূক্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিন এবং ২২নং আসামী বারির পরামর্শক্রমে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিনকে (সে তখন ঢাকায় স্থানান্তর হয়ে যাচ্ছিলো) নির্দেশ দেন যে, সে যেনো ঢাকায় গিয়ে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জেনে নেয় যে তিনি (২নং আসামী মোয়াজ্জেম) ঢাকাতে তার (৩১নং আসামী লেঃ রহমানের) উপস্থিতি কামনা করে কিনা। যদি তা করে তাহলে ৬নং আসামী শামসুদ্দিন যেন তাকে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠায় যে, 'বজলু গুরুতর অসুস্থ, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে।' ২২নং আসামী বারি এবং ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের অনুসরণে গ্রুপের সদস্যরা সাময়িকভাবে করাচিস্থ গ্রুপের জন্য কেবল তহবিল করবে বলেও সভায় স্থির করা হয়।

৮৩. ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১৩, গ্রীন স্কোয়ার, ঢাকাতে কয়েকটি সভা আহ্বান করেন। এই সভাগুলোতে নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. দলিল উদ্দিন, আসামী নং-৯

৫. রিসালদার শামসুল হক, আসামী নং-২০

৬. এম. আলী রেজা, আসামী নং-৩৩

৭. ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ, এ, এম, সি, আসামী নং-৩৪

৮. রমিজ, সাক্ষী নং-১২

৯. জালাল উদ্দিন, সাক্ষী নং-১৯ এবং

Dhaka University Institutional Repository

১০. আনোয়ার হোসাইন, সাক্ষী নং-২০।

এই সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যাবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এই সূত্রে ১৯নং আসামী শামসুর রহমানকে জাকার্তায় এবং ২৫নং আসামী মোতালেবকে পেশওয়ারে টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু তারা আসেন নি।

৩৪ নং আসামী খুরশীদ সদ্য করাচি থেকে ঢাকা পৌঁছেছেন। তিনি ভারতের আগরতলায় প্রতিনিধি প্রেরণের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। পূর্বোক্ত সভাসমূহে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক. সীমান্তের ওপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আসন্ন বৈঠকে ৩৩নং আসামী রেজা এবং তার সঙ্গে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব প্রতিনিধিত্ব করবে।

খ. প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিবেন ৩৩নং আসামী রেজা।

গ. ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের যে তালিকা দেখিয়ে ৩৩নং আসামী রেজার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে সেই তালিকাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

ঘ. আগরতলার সভায় অস্ত্র চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে এবং বর্ধিত আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হবে।

ঙ. প্রতিনিধিরা ফেনী সীমান্ত দিয়ে গোপনে আগরতলা যাবেন, এবং

চ. ১৭নং আসামী জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রমের বিষয়টি তদারক করবেন এবং এ ব্যাপারে তার প্রভাব খাটাবেন, এমনকি প্রয়োজন হলে সীমান্তে কর্তব্যরত ই.পি.আর কর্মকর্তাদের ঘুষ দিবেন যাতে প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রম নিশ্চত ও নিরাপদ করা যায়।

৮৪. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ৩য় কিংবা ৪র্থ সপ্তাহে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ঢাকায় ডেকে এনে তার হাতে একটি খাম দিয়ে সেটি মিঃ পি.এন. ওঝাকে পৌঁছাতে বলেন। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ঐদিন সন্ধ্যায়ই তা করেন। এই খামের মধ্যে ছিলো কতগুলো কোড শব্দ, প্রতিনিধিরা যে স্থান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করবেন তার নাম এবং উপরোল্লিখিত প্রতিনিধিদের নাম।

৮৫. পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের ১১ জুলাই কথা অনুযায়ী--৩৩নং আসামী রেজা এবং ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবসহ নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেনী পৌঁছেন (জেলা নোয়াখালী) প্রতিনিধিরা যাতে নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের আগরতলা পৌঁছাতে পারেন সেজন্যই অন্যরা তাদের সঙ্গে সীমান্ত পর্যন্ত যান :

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

Dhaka University Institutional Repository

২. সামাদ, আসামী নং-৮

৩. দলিল উদ্দিন, আসামী নং-৯

৪. রেজা, আসামী নং-৩৩ এবং

৫. জালাল, সাক্ষী নং-১৭।

উপরোল্লিখিত ষড়যন্ত্রকরীরা ফেনী রেল স্টেশনের কাছে হোটেল ডিনোফায় অবস্থান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব টেলিফোন করে ১২নং সাক্ষী রমিজকে ফেনী আসতে বলেন। ফলে, ১২নং সাক্ষী রমিজ ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে পি.আই.এ'র একটি স্টাফ গাড়িতে করে ঐদিন রাতেই ফেনী পৌছেন।

৮৬. ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই রাত ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ১২নং সাক্ষী রমিজ, ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন এবং ৯নং আসামী দলিল উদ্দিন ছাড়া সবাইকে পি. আই. এ.'র স্টাফ গাড়িতে করে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি বড় রাস্তায় নামিয়ে দেন। এরপর ১২নং সাক্ষী রমিজ এবং ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন ঐ রাতেই চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। ১৭নং সাক্ষী জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদ্বয়ের ভারতীয় স্থলভাগে প্রবেশ তদারক করেন।

৮৭. ১৯৬৭ সালের ১৩ জুলাই রাতে কোনো এক সময় ঐ প্রতিনিধিদ্বয়ের ৩৩নং আসামী রেজা এবং ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব আগরতলা থেকে একটি ট্রাকে করে ফেনীতে হোটেল ডিনোফায় ফিরে আসেন।

৮৮. ১৯৬৭ সালের ১৫ জুলাই ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে উক্ত সভার ফলাফল জানানোর জন্য তারা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

৮৯. ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের শেষদিকে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানসহ মিঃ পি. এন. ওঝার সঙ্গে তার ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে ষষ্ঠবারের মতো দেখা করেন। পি. এন. ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি তখনও তার সরকারের পক্ষ থেকে আগরতলা বৈঠকের কোনো ফলাফল জানেন না। কিন্তু তিনি চুপিসারে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে জানিয়ে দেন যে, ভারতীয় কর্মকর্তারা এখানকার প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তায় আস্থাবান নন।

৯০. ঐ একই মাসে (জুলাই, ১৯৬৭) ৪নং আসামী সুলতান করাচি সফর করেন। সেখানে ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের বাসায় ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বাসায় ঠিকানা--১৪/৪ জি, মার্টিন কোয়ার্টারস, করাচি। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. সুলতান, আসামী নং-৪

২. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

৩. জহুরুল হক, আসামী নং-১৭

Dhaka University Institutional Repository

৪. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং-১২

৫. লেঃ রহমান, আসামী নং-৩১ এবং

৬. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

এছাড়া আরও তিন ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদের নাম দেখা যায় পাইলট অফিসার মির্জা, এস. এম. আলী এবং জয়নুল আবেদীন। এর মধ্যে শেষের দু'জনের পরিচয় উদঘাটন করা যায় নি এবং প্রথমজন অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে থাকায় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় নি।

৪নং আসামী সুলতান ঐ সভায় বলেন যে, তিনি কিউবার বিপ্লব স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঐ ধরনের একটি বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যই তিনি বেঁচে আছেন। তিনি প্রধান প্রধান কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি দেখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেন যে, এই সভায় উপস্থিত সকলে গ্রুপের লক্ষ্যে পৌছার জন্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করার শপথ করুক।

৯১. এর সপ্তাহ দুয়েক পরে, ১৯৬৭ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের পূর্বোক্ত বাসায় আরেকটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. লেঃ রহমান, আসামী নং-৩১

২. লেঃ আবদুর রউফ, আসামী নং-৩৫

৩. জহুরুল হক, আসামী নং-১৭

৪. সুলতান, আসামী নং-৪

৫. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

৬. বারি, আসামী নং-২২

৭. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

এছাড়াও উপস্থিতিদের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে--জয়নুল আবেদীন ও এম.এস. আলী বলে এবং আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে অস্পষ্টভাবে লেখা। এদের কারোর পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা যায় নি।

ঐ সভায় ৩১নং আসামী লেঃ রহমান সদস্যদেরকে এই নির্দেশ দেন যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠনের যে মূল অংশ কাজ করছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে সবাই যেনো কাজ করেন। এরপর ৩৫নং আসামী লেঃ আবদুর রউফ উপস্থিত সদস্যদেরকে বাংলায় শপথ বাক্য পাঠ করান। ঐ সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহও গ্রহন করা হয় :

ক. ১৫নং সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম মৌরিপুর এলাকা থেকে চাঁদা তুলবেন এবং সদস্য তালিকাভুক্তি করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ড্রিগ রোড থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন।

গ. ১৭নং আসামী জহুরুল হক কোরাঙ্গী এলাকা থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি চাকলালা, পেশোয়ার, কোহাট সারগোদা সফর করবেন।

৯২. ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ঢাকা সফর করেন। তারা ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপরই তাদেরকে বলা হয় যে, তিনি, স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৩৩নং আসামী রেজা আগরতলা গিয়েছিলেন।

৯৩. ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ৩৫নং আসামী লেঃ আবদুর রউফ ২৯নং আসামী জলিলের ক্লেটন কোয়ার্টারের বাসায় একটি জরুরি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

২. বারি, আসামী নং-২২

৩. জলিল, আসামী নং-২৯

৪. লেঃ রহমান, আসামী নং-৩১

৫. লেঃ আবদুর রউফ, আসামী নং-৩৫

৬. শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬ এবং

৭. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

এই সভায় উপস্থিতদের মধ্যে আরও তিনজনের নাম দেখা যায়--ক্যাপ্টেন আফতাব চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন এবং সিদ্দিকুর রহমান। কিন্তু এদের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা যায় নি।

এই সভায় ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ এবং ৩১নং আসামী লেঃ রহমান কতগুলো আশঙ্কাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাদের সন্দেহ যে, তারা সন্দেহভাজন হিসাবে কড়া নজরের মধ্যে আছেন। ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ সভায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আর কোনো নতুন সদস্য সংগ্রহ না করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি গ্রুপের সদস্যদেরকে ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার উদ্যোগ নিতে বলেন। ফলে, গ্রুপের সদস্যরা ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিজস্ব শহরগুলোতে চলে যেতে থাকে।

৯৪. ২৩নং আসামী সার্জেন্ট শামসুলের হকের পরামর্শে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ১৭নং আসামী জহুরুল হক চাকলালা পি. এ. এফ স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তিনি ২১নং সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেনের সাক্ষাৎ পান। ১৭নং আসামী জহুরুল হক ২১নং সাক্ষী রজব হোসেনকে জানান যে, সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আর্জনের জন্য একটি গ্রুপ গঠিত হয়েছে। ২১নং সাক্ষী রজব হোসেনকে সেই

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপে যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু ২১নং সাক্ষী রজব হোসেন এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করতে অস্বীকার করেন।

৯৫. ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ৩৩নং আসামী রেজা ১২নং সাক্ষী রমিজের কাছ থেকে পি. আই. এ'র একটি ক্রেডিট টিকিট পান এবং এর মাধ্যমে ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুস ও ২৫নং আসামী ক্যাপ্টেন মোতালেবকে একথা জানাতে লাহোর-পেশোয়ার যাত্রা করেন যে, তার মনে হয় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম সংগঠনের তহবিল ব্যবহারে অনিয়ম করেছেন। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুস এবং ২৫নং আসামী ক্যাপ্টেন মোতালেব যথাক্রমে লাহোর ও পেশোয়ারে পোস্টিং পেয়ে চলে গিয়েছেন।

৯৬. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ১৫নং সাক্ষী সিরাজ 'প্রিভিলেজ লিভ'-এ ঢাকা যান। ঠিক ঐ সময়ই ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিন, ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ এবং ৩১নং আসামী লেঃ রহমানও ছুটিতে ঢাকা পৌছান।

৯৭. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ২৪নং সাক্ষী প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লিডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসায় একটি সভায় মিলিত হন। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. ফজলুল হক, আসামী নং-১১

২. এম. এ. রাজ্জাক, আসামী নং-১৬

৩. কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং-১৪

৪. জাকির আহমদ, সাক্ষী নং-২২

৫. সার্জেন্ট এম. আবদুল হালিম, সাক্ষী নং-২৩ এবং

৬. চৌধুরী , সাক্ষী নং-২৪।

এই সভায় আলোচনা হয় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং তার অনুসারী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থপরতার কারণে গ্রুপের যে দুরবস্থা হয়েছে সেখান থেকে গ্রুপকে উদ্ধার করে এর কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করা দরকার।

৯৮. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ২২নং সাক্ষী জাকির ২৫নং সাক্ষী উইং কমান্ডার আশফাক মিয়াকে জানান যে, কয়েকদিন আগে ২৩নং সাক্ষী হালিম তাকে ২৪নং সাক্ষী চৌধুরীর বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন ও সেখানে তিনি নিম্নোক্তদেরকে সমবেত দেখেছেন :

১. ফজলুল হক, আসামী নং-১১

২. এম. এ. রাজ্জাক, আসামী নং-১৬

৩. চৌধুরী, সাক্ষী নং-২৪

৪. কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং-১৪ এবং

Dhaka University Institutional Repository

৫. হালিম, সাক্ষী নং-২৩।

২২নং সাক্ষী জাকির ২৫নং সাক্ষী আশফাক খানের নিকট অভিযোগ করেন যে, উপরোল্লেখিত ব্যক্তিরা কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন।

৯৯. ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ১৫নং সাক্ষী সিরাজের বন্ধু জনৈক মিঃ মালিকের ঢাকাস্থ শুক্রবাদের বাসায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ একটি সভায় মিলিত হন :

১. লেঃ রউফ, আসামী নং-৩৫

২. মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং-৩০

৩. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫ এবং আরো কয়েকজন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় নি।

এই সভায় গ্রুপের কর্মকাণ্ডকে আড়াল করে রাখার জন্য ঢাকায় একটি করিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি আলোচনা হয়। ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ গ্রুপের কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার উদ্যোগ নেন।

১০০. এর অল্প কয়েকদিন পরেই ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদের গ্রেফতার করা আরম্ভ হয় এবং এইভাবে তাদের কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হয়।

এখানে যথাবিহিত সম্মানপূর্বক প্রর্থনা এই যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং এখানে তা সান্নিবেশিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে আসামীদের যেনো বিচার করা হয়।

উৎস : ফয়েজ আহমদ, 'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৪ পৃ. ৮৯-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট--৩

শেখ মুজিবের জবানবন্দী

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আমাকে লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিলো এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়তান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিলো।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়--যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়, তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর

Dhaka University Institutional Repository

পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধীদল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভরতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইউবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলো।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আস্থাবান--আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আর্ন্তজাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান--ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করি। ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান--উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি করা হইয়াছিল।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহ যুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের

Dhaka University Institutional Repository

করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা-বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অর্ন্তবর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন, কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পর দিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন। কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীনে মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে--সম্ভবত আটই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যার্বতন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু নেতৃবৃন্দ। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমন চৌধুরী, এম. এন. এ. প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী,

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক্তন এম. এন. এ. জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহিউদ্দীন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্রগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভাগিনেয়--পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুলকে কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোককে গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতোদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন ততোদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বর্হিজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না। বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচমাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যতো অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততোই উত্তম।

এই বিচার কার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং আমার অন্যতম কৌশুলি নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামালায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান--এই তিনজন সি. এস. পি অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনও ডাঃ সঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন কর্মচারী পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম. এন. এ ও এম. পি. এ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম. এন. এ, এম. পি. এ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল. এম. এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডাঃ সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডাঃ সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল--দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম--ছয় দফার কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিলো এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিলো না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ হইয়াছিলো যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে--তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে--এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং এবম্বিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্রজাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

উৎস :--*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ—দলিল পত্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৯-৩৬৩।